লোক প্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৮, চৈত্র ১৪০৪

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

একাদশ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৮, চৈত্র ১৪০৪

সম্পাদনা পরিষদ

এ. কে. এম. নাসিরুল হক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৮, চৈত্র ১৪০৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল

সম্পাদক ঃ **আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান**

© ১৪০৪ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১৫-২০ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৯৩৩২০১৬
ই-মেল	ঃ	বিপিএটিসি @ বাংলা. নেট
বিপিএটিসি	ঃ	প্রকা-৬/বাজা-১০/৯৮
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.11, March 1998, Chaitra 1404

Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : A. K. M. Mahbubuzzaman

© 1404 Bangladesh Public Administration Training Centre

Telephone	:	831715-20 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
Fax	:	9332016
E-Mail	:	bpatc @ bangla. net
BPATC	:	Pub-6/BJ-10/98
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৮, চৈত্র ১৪০৪

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান	১
২.	বাংলাদেশের দন্ডবিধি (Penal Code) ; একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা মোঃ হাসিবুর রহমান	১১
৩.	বস্তি উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সমাধান (বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত) সৈয়দ শামসুল আলম	৩৩
৪.	বাংলাদেশে মাদকাসক্তি প্রবণতা ঃ একটি সমীক্ষা বেগম তাহ্‌মিনা আখতার ও বেগম মাজেদা হোসেন চৌধুরী	৫৩
৫.	মহিলা ও শিশুদের অবস্থা পর্যালোচনা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান	৭১
৬.	ইউনিয়ন পরিষদ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	৯৫
৭.	পুস্তক পর্যালোচনা ঃ রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা (অনুবাদ : কবি শামসুর রাহমান) মোঃ আনোয়ার হোসাইন	১১১

পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান *

ভূমিকা

পরিকল্পনা দলিলে অর্থনীতির সামষ্টিক (Macro) তথা ব্যষ্টিক (Micro) অবয়বের উন্নয়নের রূপরেখা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। সামষ্টিক (Macroeconomic) অবয়বে অর্থনীতির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চলক যথা বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয়, মোট আমদানী বা রপ্তানী এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য প্রক্ষেপণ করা হয়। ব্যাষ্টিক অবয়বে খাতভিত্তিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। পরিকল্পনা দলিলে অতীত উন্নয়ন প্রয়াসের ব্যর্থতা বা সফলতার ইতিবৃত্ত ভবিষ্যত উন্নয়নের গতিধারার সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মূলত পরিকল্পনা দলিল অর্থনীতির একটি মুকুর (Mirror), যার মাধ্যমে অর্থনীতির অবয়ব এবং উন্নয়নের গতিধারা ও পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ পরিক্রমার বিভিন্ন ধারা থাকতে পারে। আহরিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রাধিকার নিরুপণ (Prioritization) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করলে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হতে পারে। পরিকল্পনা দলিলে সেজন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যের অগ্রাধিকারের (Prioritization) প্রশ্নটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন একক কোন সংস্থার কাজ নয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, সরকারী অধিদপ্তর বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যদিও কাজটি বিভিন্ন ইউনিটের সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বা পরিকল্পনা কমিশন প্রধান দায়িত্ব

---

* সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ লোক -প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

পালন করে থাকে। পরিকল্পনা দলিলের প্রাথমিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে পরিকল্পনা দলিল প্রকাশনা পর্যন্ত সকল কাজকর্মই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় বাস্তবায়ন করা হয়।

পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন একটি সুসংহত কর্মপ্রয়াস। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কর্ম বিভাজন, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সম্পদের বিভাজন একটি জটিল প্রক্রিয়া। স্তর ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবিধ কার্যাবলী আলোচনা করা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর বিভাজন এবং উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল বা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাজার অর্থনীতির পরিবর্তিত অবস্থায় পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত পরিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সমন্বিত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা ৫ বৎসর মেয়াদী হয়ে থাকে। উন্নয়নের যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ এর মূল লক্ষ্য। সেজন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্দেশ্য নির্ধারণে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে তথ্যের অবাধ আদান প্রদান অপরিহার্য।

সাধারণত, কেন্দ্রীয়ভাবে বিন্যস্ত একটি পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ইউনিটসমূহের সংযোগ ও সহযোগিতা নিয়ে আসা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে বিন্যস্ত এই ইউনিটকে পরিকল্পনা কমিশন বলা হয়ে থাকে। যেহেতু পরিকল্পনা কমিশনের প্রশাসনিক প্রাধান্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিকল্পনা হতে পারে, সেজন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকায় যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। মেক্সিকো বা ইসরায়েলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৯৬১ বা ১৯৬৫ সালের পূর্বে ছিলনা। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রকৃতি বা ধরন বেশ কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মপন্থা গ্রহণের ধারা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনাবিদদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়-দায়িত্ব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের হাতে ন্যস্ত। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা দলিলের খাত ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশন

দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইউনিট থেকে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা এবং লক্ষ্যের আলোকে পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধান প্রধান এজেন্ট হচ্ছে নীতি নির্ধারক ইউনিট, পরিকল্পনাবিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং গবেষকবৃন্দ। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে এই ইউনিটসমূহের মধ্যে তথ্যের অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অপরিহার্য। এই তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিম্নের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা ঃ

দেশের উন্নয়নের ধারা বা প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন মূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায়নের সাথে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক থাকে এবং পরিকল্পনায় রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক মেনিফেষ্টোর প্রতিফলন থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়ন রাজনীতিবিদ এবং পরিকল্পনাবিদদের নীতি নির্ধারণে প্রায়শঃই আলোচনায় বসতে হয়।সেজন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন কখনও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। কমান্ড অর্থনীতিতে, যেমন তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে, সুপ্রীম সোভিয়েতে পরিকল্পনার দর্শন ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হত। পূর্ব ইউরোপসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাফল্যজনক উত্তরণের পর উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংসদ বা পার্লামেন্টে এখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (National Economic Council) পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মিশ্র অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের ভূমিকা স্বীকৃত। সরকারী প্রশাসন যন্ত্র বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের কর্মকান্ডকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, বেসরকারী খাতও সরকারী নীতি প্রণয়নকে বেসরকারী খাতের অনুকূলে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের কেন্দ্র বিন্দু (Nucleus) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা দপ্তরে (Plannning Department) এই অঞ্চলের পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদিত হত। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয় ইসলামাবাদে পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যাদি সম্পাদিত হত। পরিকল্পনা দপ্তরটি ১৯৫৬ সালে স্থাপিত পরিকল্পনা বোর্ডের এক বর্ধিত সংস্করণ ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর নতুন দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭২ সালে একটি অধ্যাদেশের (Resolution) মাধ্যমে কাজ শুরু করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে টেকনোক্রাট এবং বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনার সফলতার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হয়। পরিকল্পনাবিদ, টেকনোক্রাট এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতার বিভিন্ন প্রবাহ রয়েছে। অর্থনীতিবিদ বা পরিসংখ্যানবিদগণ উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহের তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা কমিশন একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছাড়াও আর ২টি বিভাগ রয়েছে।

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

জাতীয় আয়ের উপর সঠিক পরিসংখ্যান পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভিত্তি বৎসরের (Base year) জাতীয় আয় থেকেই পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয়ের প্রক্ষেপণ করা হয়ে থাকে। খাত ভিত্তিতে যথা কৃষি, শিল্প, সেবা, পরিবহন ও অন্যান্য খাতের জাতীয় আয়ের অবদান নির্ধারণ সঠিক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অন্যান্য অর্থনৈতিক যথা রাজস্ব, প্রশাসনিক এবং অঞ্চল ভিত্তিক অর্থনৈতিক উপাত্তের প্রয়োজন হয়।

২। পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে নেয়া হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে সমস্ত প্রকল্প নেয়া হয়, সে সমস্ত প্রকল্পের সুষ্ঠ সমাপ্তিতে পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব রাখে। প্রকল্প সুষ্ঠভাবে সমাপ্তিতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সনাক্তকরণ এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সাংগঠনিক অবয়বে পরিকল্পনা কমিশনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ম্যাক্রো ডিভিশন ঃ পরিকল্পনার সার্বিক অবকাঠামো প্রণয়ন, ম্যাক্রো চলকসমুহ প্রক্ষেপণ, অতীত পরিকল্পনার মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনাধীন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন মূলত ম্যাক্রো ডিভিশনের ভূমিকা। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং প্রোগ্রামিং ডিভিশন এই বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের

বহুবিধ কাজকর্ম কয়েকটি উইং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। মোট পাঁচটি উইং যথা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি উইং, রাজস্ব ও মুদ্রানীতি উইং, ম্যাক্রো এন্ড প্রেক্ষিত পরিকল্পনা উইং, জাতীয় আয়, চলতি অবস্থা ও বেসরকারী বিনিয়োগ উইং এবং মূল্যায়ন উইংয়ের মাধ্যমে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ নিয়মিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

মাইক্রো ডিভিশন ঃ খাত ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রকল্প গ্রহণ এই ডিভিশনের মূল দায়িত্ব। মাইক্রো ডিভিশনের আওতাধীন রয়েছে ঃ

১। কৃষি, পানি সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন

২। শিল্প ও শক্তি

৩। ভৌত অবকাঠামো, গৃহায়ণ, পরিবহন, কম্যুনিকেশন

৪। সামাজিক অবকাঠামো, শিক্ষা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি, জনশক্তি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী নিম্নরুপ ঃ

(ক) **প্রয়োজন নিরূপণ ঃ** পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম কাজ হল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে সঠিক প্রয়োজন নিরূপণ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিক নির্দেশনা নেওয়া হয়। বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) দ্বারা প্রয়োজন নিরীক্ষণের পর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ যা নির্বাচনপূর্ব অর্থনৈতিক মেনিফেস্টোতে থাকে, সে সব বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রয়োজন নিরূপণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

(খ) **প্রাপ্য সম্পদের প্রাক্কলন ঃ** পরিকল্পনাধীনে বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সম্পদের প্রাক্কলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের যথাযথ প্রাক্কলন মূলত অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধির হারের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়নশীলদেশে সম্পদের প্রাক্কলনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খাতের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি (Commitment) এবং বন্টন (Disbursement) এর টাইম সিরিজ উপাত্তের যথাযথ পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে পরিকল্পনাকালীন সময় প্রতিশ্রুতি এবং বিভাজনের প্রক্ষেপণ করা হয়।

(গ) **অর্থ বিভাজনের জন্য বিভিন্ন খাতসমূহের পারস্পরিক অগ্রাধিকার নির্ধারণঃ** সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বিভাজনের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়। পরিকল্পনাকালীন সময়ে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদের

বৃদ্ধিতে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যথা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বা সেবার প্রবৃদ্ধির উপরই মূলত পরিকল্পনায় অর্থ বিভাজন করা হয়ে থাকে।

(ঘ) কমান্ড অর্থনীতিতে সার্বিক চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন খাতের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য যা Physical balance নামে আলোচিত হয়ে থাকে।

ঙ) পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন।

চ) সম্ভাবনাপূর্ণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্প নির্বাচন যা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উপর্যুক্ত কার্যাবলীর আংশিক বাস্তবায়ন কোন কোন সময় পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। আংশিকভাবে গৃহীত পরিকল্পনা প্রণয়নকে দু'ভাগে দেখা যেতে পারে ঃ

(ক) প্রকল্প ভিত্তিক ধারা (Project by Project Approach)

(খ) সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারা (Integrated Public Investment Approach)

(ক) প্রকল্প ভিত্তিক ধারা

প্রকল্প ভিত্তিক ধারায় বেশ কিছু প্রকল্প বিবেচনা করা হয় যা পরিকল্পনাধীন সময় বিচ্ছিন্ন আকারে নেয়া হয়। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা অনেক সময় এই সমস্ত প্রকল্পের সমাহারে প্রতিফলিত হয় না। প্রকল্প ভিত্তিক ধারায় উন্নয়নের দর্শন বা দীর্ঘ মেয়াদী রূপরেখা প্রতিফলিত হয় না। প্রকল্পের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক সেবা সংহতকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি বা আমদানীর বিকল্প উদ্ভাবন ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও বিনিয়োগে পরিবেশের সাথে সার্বিক উন্নয়নের সম্পৃক্ততা সহনীয় পর্যায়ের নিচে থাকে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রকল্পসমূহের প্রভাব নীতি বাস্তবায়ন বা লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তেমন সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেনা।

প্রকল্প ভিত্তিক ধারায় যেহেতু প্রাথমিকভাবে সম্পদের প্রাক্কলন না করেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, সেহেতু প্রকল্প ভিত্তিক সম্পদের বিভাজনে একক (Unique) নিয়ম অনুসরণের অভাব লক্ষ্যণীয়। প্রকল্প নির্বাচনের কারিগরি, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক দিকগুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়না। কোন কোন সময় সীমিত সম্পদ সম্পর্কহীন প্রকল্প সমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিভাজিত হয়ে থাকে।

(খ) সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারা

সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারায় প্রকল্প ভিত্তিক ধারার বেশ কয়েকটি ত্রুটি সংশোধন করা যায়। এখানে প্রাথমিকভাবে সম্পদ লভ্যতার প্রাক্কলন করা হয়। সম্পদ লভ্যতার বিভিন্ন দিক, যেমন নতুন কর ব্যবস্থার মাধ্যমে লব্ধ আয়, মুদ্রাস্ফীতি বহির্ভূত (Non-inflationary) অভ্যন্তরীণ অর্থগ্রহণ (Domestic Borrowing) বা বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রাপ্য সম্পদের প্রাপ্তি নিরসন করা হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি খাতের মধ্যে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়। সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ বার্ষিক বা পঞ্চ বার্ষিক মেয়াদী হতে পারে। তবে সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারায় অনেক সময় অর্থনীতির সার্বিক আয় বা উৎপাদনের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োগ থাকে না।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা উত্তর পরিকল্পনা প্রণয়ন (১৯৪৭-১৯৫৩) প্রকল্প ভিত্তিক ধারার অবয়বে ছিল। বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যেখানে পরিকল্পনা প্রণয়নের সনাতন পদ্ধতি ক্রমশই রূপান্তরিত হচ্ছে, সেখানে প্রকল্প ভিত্তিক ধারা বা সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারার খুব একটা উপযোগ নেই।

সমন্বিত ধারা (Comprehensive)

পরিকল্পনা প্রণয়নের (Comprehensive) সমন্বিত ধারায় সমগ্র অর্থনীতির উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। সাধারণত সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদের (GDP) প্রবৃদ্ধির হারের প্রক্ষেপণ প্রথমেই করা হয়। সঞ্চয়ের হার এবং মূলধন উৎপাদের অনুপাত (Capital output Ratio) চলক ধরে হ্যারোড ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেলের মাধ্যমে ইপ্সিত বিনিয়োগ হার নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত বহুমাত্রিক মডেলের (Multisectoral Model) মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চলক যথা ভোগ, বিনিয়োগ, আমদানী, রপ্তানী ইত্যাদির উপর সিমুলেশনের (Simulation) মাধ্যমে প্রক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

সমন্বিত ধারার পরিকল্পনা প্রণয়নে জ্যান টিনবারগেন (Jan Tinbergen, 1967) একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনটি ধাপের অবতারণা করেন। প্রতিটি ধাপে করণীয় কার্যাবলী এবং উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে বিভিন্ন অনুসৃত পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। জ্যান টিনবারগেনের মতে তিনটি ধাপ হলঃ

১। সামষ্টিক ধাপ (Macroeconomic stage)

২। খাতভিত্তিক ধাপ (Sectoral stage)

৩। প্রকল্প ধাপ (Project stage)

সামষ্টিক ধাপ

সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চলক যথা বিনিয়োগ, ভোগ, আমদানী, রপ্তানী মুদ্রার বিনিময় হার, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিকল্পনাধীন সময়ে প্রক্ষেপণ করা হয়। এই প্রক্ষেপণ সাধারণত অর্থনীতির সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদের অনুমিত প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। সাধারণত মাক্রো মডেলের মাধ্যমে বিভিন্ন চলকের প্রক্ষেপণের মান নির্ণয় করা হয়। মাক্রো মডেলের বিভিন্ন প্যারামিটারের (Parameter) মান টাইম সিরিজ (Time series) উপাত্ত থেকে বের করা হয়।

খাতভিত্তিক ধাপ

খাতভিত্তিক ধাপে বিভিন্ন খাতের চূড়ান্ত চাহিদা নিরূপণ করা হয়। বিভিন্ন খাতের চাহিদা নিরূপণ বিভিন্ন খাতের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের প্রবাহ বিন্যাসের মাধ্যমে করা হয় যাতে করে কোন একটি খাতের উৎপাদনে আধিক্য বা অভাব পরিলক্ষিত না হয়। সাধারণত খাত ভিত্তিক আলোচনা (Sector studies) বা ইনপুট-আউটপুট টেবিলের মাধ্যমে এই পারস্পরিক সামঞ্জস্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমেও কোন কোন সময় Objective function কে Optimization করা হয়।

প্রকল্প ধাপ

প্রকল্প ধাপে বিভিন্ন খাতে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। প্রকল্প নির্বাচনের দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়; (ক) বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়ক প্রকল্প (খ) প্রাপ্য সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের ব্যয় সীমিত করণ।

তৃতীয় অধ্যায়

বাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের ভূমিকা অনুঘটক বা (catalytic agent) বা সহায়তাকারী (Facilitator) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেখানে বিনিয়োগ সম্ভব, সেখানে সরকারী খাতের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রকাশিত Public Sector Expenditure Review পুস্তিকায় ৭টি খাতের ৯৪টি প্রকল্পের অর্থায়ন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে করা কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সেবা ও পণ্যের দাম চাহিদা ও সরবরাহের অবাধ ধারার মাধ্যমে নির্ধারণ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে দ্রব্য বা সেবার Scarcity value এর সার্বিক প্রতিফলন হয়ে থাকে। মূল্যস্তর (Price) বিনিয়োগের একমাত্র নিয়ামক

হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সেজন্য কমান্ড অর্থনীতিতে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার (Prioritization) বিষয়টি যেভাবে গুরুত্ব পায়, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তার কোন প্রয়োগ থাকে না। তবে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বেশ কয়েকটি ব্যর্থতা রয়েছে, যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। Externality বাজার ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ। কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ষ্টেক হোল্ডার এর বাইরে তৃতীয় কোন পার্টির লাভ বা ক্ষতিকে EXTERNALITY বলা হয়। ঋণাত্মক (Negative) Externality উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, কারণ তৃতীয় পার্টির ক্ষতি উৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এসব ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। উৎপাদনের জন্য বেসরকারী বা বৈদেশিক বিনিয়োগে আইনগত সুবিধাদি প্রদানও সরকারের একটি অন্যতম দায়িত্ব।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন কারণে আয়ের বৈষম্য দেখা দিতে পারে। নীতি বাস্তবায়নে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, ভর্তুকি প্রত্যাহারের জন্য নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। সেজন্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (Social Safety Net) মাধ্যমে সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের বিশেষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবয়বে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারা ক্রমশ লোপ পাবে এবং সরকারের কার্যাবলী আইন-শৃঙ্খলা সংহতকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মুদ্রা বা রাজস্ব নীতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ড ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রায় পরিচালিত হবে, যাতে করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং মুদ্রাস্ফিতির আধিক্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলবেনা।

উপসংহার

এ প্রবন্ধে সনাতন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত বিন্যাস এবং বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের পদ্ধতিগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) সনাতন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত অবয়বে করা হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন ইন্ডিকেটেড পরিকল্পনার খসড়া পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রণয়ন করা হয়েছিল; কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ফলে বাস্তবায়িত হয়নি। ক্ষমতাসীন সরকার প্রণীত

পঞ্চম পরিকল্পনা দলিলটিতে সংখ্যাগত আধিক্য (Quantitative Dimension) রয়েছে যা মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবয়বে যথাযথ নয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবয়বে পরিকল্পনা দলিলে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগত (Qualitative Dimension) আধিক্য থাকে। পরিকল্পনা দলিলকে মুলত নীতি নির্ধারক দলিলের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১। পরিকল্পনা কমিশন, (১৯৮৭) *বিগত পাঁচ বৎসরের (১৯৮২-৮৭) বহুমুখী সাফল্যের পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা,* পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।

২। সৈয়দ আব্দুস সামাদ, (১৯৮৫) *পরিকল্পনা,* বাংলা একাডেমী।

৩। United Nations, (1987)*Guidelines for Development Planning; Procedures. Methods and Techniques.* New York.

৪। World Bank, Bangladesh, (1997) *Public Sector Expenditure Review 1997 Update, Making the Best use of Public Resources.* World Bank, South Asia Region.

বাংলাদেশের দন্ডবিধি (Penal Code)ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মোঃ হাসিবুর রহমান *

ভূমিকা ঃ

দন্ডবিধিকে Substantive Law বা মূল আইন বলা হয়। এটি অপরাধের শাস্তি প্রদানের আইন। ঐ আইনকে কার্যকর করার জন্যই মূলত Crpc বা ফৌজদারী কার্যধারা প্রয়োজন হয়। অবশ্য কয়েকটি ধারার ক্ষেত্রে (যেমন ১০৭, ১৩৩, ১৪৪ ইত্যাদি) ফৌজদারী কার্যধারাও মূল আইন হিসেবে কাজ করে থাকে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যধারা দন্ডবিধি বা পেনাল কোডকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রসিডিউর হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই সিআরপিসি-কে 'এ্যাডজেকটিভ ল' বা 'প্রসিডিউরাল ল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যেমন সমন, ওয়ারেন্ট ক্রোকী পরোয়ানা ইত্যাদি জারী করে আসামীকে আদালতে হাজির করা ইত্যাদি। তারপর আসে সাক্ষ্য আইনে সাক্ষীর প্রশ্ন। এইগুলির মাধ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়, অন্যদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংশোধন করা যায় ঠিকই, কিন্তু দেওয়ানী আদালতের দেওয়ানী আইনের মত কোন ক্ষতি পূরণ আদায়ে দন্ডবিধি মূলত ব্যবহৃত হয়না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ডবিধিও ক্ষতিপুরণ আদায়ে আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপীলের আগে দেখা হয় আসামী দোষ করেছে কি করেনি। দোষ করলেই নিম্ন আদালত শাস্তি দিয়ে থাকে। আপীলের আদালত বিবেচনা করে কোন্ অবস্থায় দোষ করা হয়েছে। অবস্থা বিচার করে আসামীকে অনেক সময় খালাস দেয়া হয় বা শাস্তি কমিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের প্রকৃত অবস্থা বিচার্য হয়। অনুরূপ অবস্থা হলে হাকিম হয়তো নিজেও

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সেই দোষ করে বসতেন। নিম্ন আদালত যা খোঁজে না উপরের আদালত তা আপীলের সময় খুঁজে থাকে। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের দুইটি ডিভিশন, আপীল ও হাইকোর্ট ডিভিশন। আপীলেট ডিভিশন প্রধানত স্পষ্টতার অভাবে আইনের ও শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রশ্ন হলে, কারো মৃত্যুদন্ড হলে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড হলে এবং হাইকোর্টের দ্বারা সম্পাদিত হাইকোর্ট অবমাননার মামলা হলে আপীল গ্রহণ করতে পারেন।

মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্ট অরিজিনাল মামলা গ্রহণ করতে পারেন বা অন্যের রিপোর্টে নিম্ন আদালত হতে মামলা তুলে আনতে পারেন। অন্য সব ক্ষেত্রে এটি আপীল গ্রহণ করে থাকেন। সুপ্রীম কোর্টেরও আপীলে বলবৎ রাখা মৃত্যুদন্ড মহামান্য রাষ্ট্রপতি (বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে) মওকুফ করতে পারেন। যেখানে রাষ্ট্রপতিও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন, বৃটেনের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড চ্যান্সেলর (ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে যা আপীলের একমাত্র আদালত ছিল) তা অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পারেন। তাই কমনওলেথ এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেখান থেকে আসতে পারে। এইভাবে বাংলাদেশ পেনাল কোড দ্বারা শাস্তি বিধান, দন্ড মওকুফ, হ্রাস ও দন্ড বহাল রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

২। অপরাধ

দন্ডবিধিতে যে কোন প্রমাণিত অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তির কথা লেখা আছে, সর্বনিম্ন শাস্তির উল্লেখ নাই। সর্বনিম্ন শাস্তি হাকিমের বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। ১৮৩৩ সালে লর্ড মেকলে এই দেশের আইন প্রণয়ন আরম্ভ করেন এবং ইংল্যান্ডের অনুকরণে আইন ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন। দন্ডবিধি লর্ড মেকলে কর্তৃক ১৮৬০ সালের ৬ই অক্টোবর প্রণীত হয় এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৬২ সাল থেকে কার্যকর হয়। দন্ডবিধি অনুসারেই সমস্ত অপরাধের শাস্তি প্রদান করা হয়। এখানে অপরাধ বলতে ফৌজদারী অপরাধ বা যে অপরাধের জন্য সংশোধন, অপরাধ দমন, অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধের প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অপরাধের জন্য ভুক্তভোগী ব্যক্তি যা হারালো বা যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, তা দেওয়ানী মামলার মত আর ফেরত আসবে না।

দন্ডবিধি ধারা ২এ অপরাধের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অত্র বিধির বিধানসমূহের পরিপন্থী যে কার্য বা বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হবে, তার প্রত্যেক কার্য ও বিচ্যুতির জন্য এই বিধির অধীনে এবং প্রকারান্তরে নহে, দন্ডনীয় হবে। অর্থাৎ দন্ডবিধি অনুসারে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা করলে এবং যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা না করলেই 'অপরাধ' হবে।

৩। দন্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি

অন্য সজ্ঞায় অপরাধ বলতে যত অন্যায় এবং ক্ষতিকর কাজই বুঝানো হোক না কেন, দন্ডবিধি অনুসারে এই বিধির বিরুদ্ধে কিছু করাটাই অপরাধ। দন্ডবিধির সঙ্গে ফৌজদারী কার্য বিধির নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ রয়েছে ঃ (১) দন্ডবিধি ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারেই বাস্তবায়িত হয়, দন্ডবিধি Substantive Law বা মূল আইন এবং ফৌজদারী কার্যবিধি Procedural Law or Adjective Law. দন্ডবিধি কিভাবে কার্যকর করা যাবে সে সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধি পথ বাতলিয়ে দেয়। এই বিধিতে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়। দন্ডবিধিতে ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায় না। অবশ্য 'কোয়াসি ক্রিমিন্যাল কেস'এ ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়। যেমন, বাপকে পাগল বলে মেয়ের বিয়ে নষ্ট করা, হাত কেটে সক্ষম ব্যক্তিকে অক্ষম করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

(২) ফৌজদারী আদালতে দন্ডবিধি অনুসারে বিচার হয় আর দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে বিচার হয়। মানহানি, আক্রমণ, উদ্দেশ্যেমূলক অপমান প্রভৃতি মামলা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার আদালতেই করা যায়। মানহানির জন্য মেয়ের বিয়ে ভাল জায়গায় না হলে তার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়। আক্রমণে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পঙ্গুত্ব এলে ক্ষতিপুরণ দাবী করা যায়। তেমনি পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যজনক অপমানে ব্যবসায়িক ক্ষতি হলেও তা আদায়যোগ্য।

(৩) 'মেন্‌স রিয়া' বা দোষযুক্ত মন নিয়ে কিছু করলে দন্ডবিধিতে তা অপরাধ। সরল মনে, সৎ অভিপ্রায়ে, সৎ বিশ্বাসে উপকার করার উদ্দেশ্যে কিছু করলে এবং তাতে কোন জানমাল বা ইজ্জতের ক্ষতি হয়ে গেলেও দন্ডবিধিতে তা অপরাধ নয়। কিন্তু দেওয়ানী মামলায় এই সমস্ত অভিপ্রায়ের চাইতে দলিল এবং ক্ষতির উপরই জোর বেশী দেওয়া হয়। সৎবিশ্বাস, যত্ন, উপকারের ইচ্ছা, এ সমস্ত দেওয়ানী মামলায় ধর্তব্য নয়। ক্ষতি যা হয়েছে তার পূরণ বা আদায়ই দেওয়ানী মামলার উদ্দেশ্য।

(৪) ফৌজদারী মামলার বাদী সরকার হয়ে থাকে, কিন্তু দেওয়ানী মামলা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেকে দায়ের করতে হয়। ফৌজদারী মামলা সর্বজনীন এবং অন্যেরও এমন বিষয় ঘটতে পারে, সেই কারণে সরকার এটি পরিচালনা করে। কিন্তু দেওয়ানী মামলা ব্যক্তিস্বার্থের প্রেক্ষিতে হয়। তাই ব্যক্তিকেই এর খরচ বহন করতে হয়। একজন খুনীর হাতে কেউ মারা গেলে সমাজের অন্যান্যদের জন্যও এটি ভয়ের কারণ। অপরাধী জীবিত থাকলে (ফাঁসিতে না গেলে) বা প্রিভেনটিভ ডি.টেনশন এ না

গেলে বা কারবাসে না গেলে অন্যের জন্য এটা ভয়ের কারণ হতে পারে। তাই ফৌজদারী মামলায় দন্ডবিধির পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেবার জন্য সরকার বাদীর পক্ষ হয়ে মামলার খরচ জোগায়।

(৫) ফৌজদারী মামলা দায়েরের সময়সীমা অনেকটা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত টিকে থাকে। নাবালক ছেলে সাবালক হয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করার পরও বাপের খুনের মামলা চাইতে পারে, কিন্তু দেওয়ানী আদালত ১২ বৎসরের স্বাভাবিক সম্পত্তি আদায়ের দাবী, ৩ বৎসরের স্বাভাবিক পাওনার দাবী এবং ১ বৎসরের ধার কর্জের দাবী না করলে তা তামাদী বা বাতিল বলে আদালত কর্তৃক বাতিল হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানীর জন্য আলাদা আলাদা আদালত থাকে। ফৌজদারী আদালতের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়রা জজ থাকেন (হাইকোর্ট ও আপীলেট ডিভিশন বাদে)। দেওয়ানী মামলার জন্য জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, সাব জজ ও সহকারী জজ (প্রাক্তন মুন্সেফ)। নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি দন্ডবিধির অপরাধ ফৌজদারী আদালতে করতে হয়, আর চুক্তিভঙ্গ, স্বত্ব পুনরুদ্ধার, ব্যক্তিগত উৎপাত ইত্যাদি মামলা দেওয়ানি আদালতে করতে হয়। চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতি চুক্তি আইনে বিচার হয়, চুক্তি ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতি 'টর্ট' আইনে বিচার হয়। যেমন কারো উচুঁ দালানের জন্য কারো বাড়ীর আলো বাতাস বন্ধজনিত ক্ষতি, ধানকল বা তাঁতকলের শব্দে কারো রাতের ঘুম নষ্ট হওয়ায় দিনে কাজের ক্ষতি, কারো এয়ারকন্ডিশন গাড়ীর জন্য অন্যের ছেলের মানসিকতায় তা পাবার চিন্তা ঢুকলে, না পেয়ে নৈরাশ্য এসে পড়ালেখার ক্ষতি হলে, ঐ ক্ষতিপূরণ এরূপ অবস্থা সৃষ্টিকারীর কাছে দাবী করা যায়, টর্ট আইনে। এখানে আলো-বাতাস ম্যানডেটরী ইনজাংশন দিয়ে আদালত কর্তৃক উঁচু দালানের কার্নিস ভেঙ্গে গরীবের বাড়ীতে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা মামলার রায়ে প্রদত্ত হতে পারে।

(৬) ফৌজদারী আদালতে দন্ডবিধির আওতায় অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দেবার জন্য হাজির করাবার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। দেওয়ানী মামলায় সাক্ষীসমূহকে হাজির করাবার দায়িত্ব মামলার পক্ষসমূহের। এই জন্য বাদীর উপর সমন জারী করা হয়। দন্ডবিধিতে অপরাধের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নাই, কিন্তু ফৌজদারী কার্যবিধিতে অপরাধের নাম 'অফেন্স' দেওয়া হয়েছে এবং অপরাধ বলতে সেই সকল কার্য করা বা কার্য হতে বিরত থাকাকে বুঝায় যা সম্পাদন করলে বা করা হতে বিরত থাকলে বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তি দন্ডনীয় হবে। ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর বে-আইনী প্রবেশ আইনের ২০ ধারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। হঠাৎ রাস্তার পাড়ে চরানো গো-মহিষ বা ট্রাকে বহন করা গো-মহিষ বা রাস্তায়

চরা গো-বৎসকে বাঁচাতে যেয়ে যাত্রীবাহী গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে বহু জানমালের ক্ষতি হতে পারে। তাই এই আইনে রাস্তায় গবাদি পশু ছাগল ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া অপরাধ। আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে ঃ

১। অপরাধ একটি অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজ

২। এই অন্যায়ের জন্য থাকতে হবে দন্ডবিধিতে শাস্তির বিধান (না থাকলে তা অপরাধ নয়)

৩। অপরাধের পিছনে দোষযুক্ত মন অবশ্যই থাকতে হবে। সৎবিশ্বাস বা সরলবিশ্বাসের বিষয় অপরাধ হিসাবে প্রমাণ করা যাবে না।

৩.১ দন্ডবিধিতে শাস্তির প্রকার

দন্ডবিধিতে দন্ড ৬ (ছয়) প্রকার ঃ (১) মৃত্যু দন্ড (এটি সর্বোচ্চ শাস্তি) (২) যাবজ্জীবন কারাদন্ড (৩) বিনাশ্রম কারাদন্ড (৪) সশ্রম কারাদন্ড (৫) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (৬) অর্থ দন্ড ও জরিমানা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এখন আর নাই। এর বদলে আছে যাবজ্জীবন কারাদন্ড। একটি মানুষ মোট কত দিন বাঁচবে তা বলা যায় না, তবে দায়রার একজন জজ সব ধারায় তাঁর ক্ষমতার এখতিয়ারের অধীন ৩০ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড দিতে পারেন। যাবজ্জীবন কারাদন্ড বর্তমানে ৩০ বৎসরের কারাদন্ডকে বুঝানো হয়।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি তার আচরণের দ্বারা শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করিয়ে নিতে পারে। দন্ড হ্রাসের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও সরকারের আছে। এটি দন্ডবিধির ধারা ৫৩ (ক) ও ৫৭তে রক্ষিত। একজন লোক আদালতের মমতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন অনেক তথ্যের অভাবে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা সরকারের অনেক তথ্য জানা থাকে। অন্তর্নিহিত তথ্য সরকারের জানা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি সরকার বা রাষ্ট্রপতির মায়া পেতে পারেন। এমনকি ঐ তথ্যগুলো দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজেরও জানার বাইরে থাকতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাই প্রধান মন্ত্রীর মাধ্যমে তাঁর কাছে নথি যেতে হয়, এটি ধারা ৫৪, ৫৫ ও ৫৫ক (দন্ডবিধি) তে উল্লিখিত।

৩(২) দন্ডবিধি বাংলাদেশের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রযোজ্য

দন্ডবিধির ধারা ৩ মোতাবেক দন্ডবিধি বাংলাদেশের আওতাভুক্ত সমগ্র এলাকায় সকল বাংলাদেশী ও বিদেশীদের উপর প্রযোজ্য। ট্রানজিটের সময় বাংলাদেশী জাহাজে বা উড়ো জাহাজে কোন বিদেশী বা বাংলাদেশী অন্যদেশে গমনকালে দন্ডবিধির বিধি ভঙ্গ করলেও সে অপরাধী হবে।

প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানই আজকের বাংলাদেশ। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি মোতাবেক বেরুবাড়ী, লাঠিটিলা, আসালাং, আংগরপোতা বাংলাদেশের অংশ থেকে ভারতে চলে গেছে এবং দহগ্রাম ছিটমহল ভিতরে এসেছে (যদিও ভারতের মর্জির উপর তিনবিঘা করিডোরের ভিতর দিয়ে এর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তিনবিঘা করিডোরে ভারতীয় বাহিনী পাহারারত আছে)। সমুদ্রের মহীসোপান ও মহীঢাল ব্যতীত ৩০ নটিকাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিস্তৃত। এর ভিতরেই দন্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। কোন বাংলাদেশী বাইরে থেকে কোন অপরাধ করে এলে বা বাইরে এর শাস্তি ঐ দেশের আইনে না হলেও বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে প্রমাণিত হলে তার শাস্তি দন্ডবিধিতে হবে। তবে পুলিশের কাছে প্রতীয়মান প্রাথমিক চার্জশীট বা পুলিশ রিপোর্ট (এফ আই আর বা এফ আর বা নন এফ আই আর) এ অথবা সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের প্রাইমাফেসি (প্রাথমিকভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া) চার্জগঠন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হওয়ার আগে দন্ডবিধিতে শাস্তি দেওয়া যাবে না। তখন চোরকেও চোর বললে তার মানহানির জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। কারণ চোরেরও মান সম্মান আছে। আদালত দোষী সাব্যস্ত চোরকে শাস্তি দিলে চোর মাথা পেতে শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু কোন পাবলিক তাকে চোর বলে অপমানিত করতে পারবে না। তাতে মান হানির মামলা চলতে পারে এবং ক্ষতিপুরণ আদায়ও হতে পারে।

৪, কারা কারা দন্ডবিধিতে দন্ডিত হবেন না

(ক) রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থাকা পর্যন্ত রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকান্ডের জন্য তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি বা দন্ডবিধিতে দন্ডিত হবেন না এবং এটি শাসনতন্ত্র সমর্থিত। রাষ্ট্রপতি না থাকা অবস্থায় তাঁর ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্য তিনিও দন্ডিত হবেন। (খ) বিদেশী কূটনীতিবিদগণ দন্ডবিধিতে অভিযুক্ত হবেন না। (গ) প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজ সম্পাদনের জন্য, বিদেশী রাজাগণ ও কুটনৈতিক কর্মচারীগণ (বাংলাদেশে বসবাসরত), যুদ্ধবন্দী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দেশে আমন্ত্রিত বিদেশী সৈন্যগণও এই দন্ডবিধির আওতাভুক্ত নন। তবে অপরাধ করলে অন্য আইনে তাদের বিরুদ্ধেও প্রসিডিং ড্র করে তার বিচার হবে। বিদেশীদের দেশ হতে বের করে দেওয়া যায় (বিদেশী কোম্পানীদের), কুটনীতিক এবং তাদের কর্মচারীদেরও। তাদের নিজ দেশের কাছে বা আন্তর্জাতিক আদালতে এবং কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত দেশের নাগরিক হলে Her Majesty Mother Queen Elizabeth, Privy Council এ Lord Chancellor এর নিকটও নালিশ পাঠানো যায়। কমন ওয়েলথের সদস্য হিসেবে (যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে)।

দন্ডবিধি তাই শুধু দন্ডেরই বিধি নয়, অপরাধের বিধিও। তাই ফৌজদারী কার্যবিধিতে কথাটি লেখা আছে। (ঘ) পুলিশদের বিচার হবে পিআরবি বা (পুলিশ রেগুলেশন অব বেংগল) এর আওতায় কিন্তু সেনাবাহিনীর বিচার হবে তাদের নিজস্ব আইনে এবং কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে যে সিভিল কর্মচারী আছে তাদের বিচার হবে দন্ডবিধিতেই। (ঙ) ৭ বৎসর বয়সের কম বয়সী শিশুদের বিচার 'রেলওয়ে কোড' এ থাকলেও দন্ডবিধিতে নেই। তারাও দন্ডবিধির শাস্তির বাইরে। তবে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাদের পিছনে কোন অপশক্তি আছে, সেক্ষেত্রে তাদের বিচার এই দন্ডবিধিতেই হবে। শিশুর পরিপক্কতা ও বুদ্ধি বিবেচনার বিচারের প্রশ্ন উঠবে। (চ) সামান্য ক্ষতিকারক কাজ, যেমন তিন টাকা ঘুষ খাওয়াও কোন কোন সময়ে দন্ডবিধিতে অপরাধ ধরা হয় না। এটা বিব্রতকর অবস্থা। বাসে উঠে কারো শরীরে অনিচ্ছা সত্বেও সামান্য ধাক্কা লেগে গেল, পদার্থ বিদ্যার 'ল অফ ইনারসিয়া', অনুসারে তখন এটা নিয়ে হৈ হুল্লা করে ও অন্যান্য বিচার পয়দা করা উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে বাদী হলেই কোন ব্যভিচারের বিচার হবে। স্বামী বাদী হলেন; স্ত্রী অন্যরকম সাক্ষ্য দিলেন এবং তা মিথ্যা বলে দাবী করলেন, তখন স্বামীর বিরুদ্ধে মানহানির বিচার হবে এবং তিনি দন্ডবিধির আওতায় মারাত্মক শাস্তির শিকার হবেন।

সামান্য অপরাধ নিয়ে বিচার পয়দা করলে সমাজের অন্যেরাও তাকে ছাড়বে না। তার বিরুদ্ধেও সেরূপ অপরাধ থাকলে পাল্টা বিচার পয়দা করবে। বিচার না দিলে দন্ডবিধিতেও বিচার হবে না। সমাজে তখন সবাই সুখে শান্তিতে যার যার কাজকর্ম করে বেঁচে থাকবে। তবে এক্ষেত্রে অভিপ্রায় ভাল হওয়া উচিত। অভিপ্রায় খারাপ নিয়ে তুচ্ছ অপরাধ নানা অজুহাতে বার বার করলে দন্ডবিধিতে অবশ্যই তার বিচার হবে। কাউকে পাগল বানাবার জন্যে (যে আগে পাগল ছিল না, খুবই ভাল ছাত্র বা পন্ডিত লোক ছিল) দেওয়ানী আইনের বিচারে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থাও হবে। একটা ভাল মানুষকেও বার বার তার নিজের দলের লোক দিয়ে পাগল-ছাগল বলালে সত্যি সত্যি সে একদিন পাগল হয়ে যেতে পারে। 'কোয়াসি সিভিল ল'তে দেওয়ানী মামলা জজ কোর্টে করলে এই পাগল বানাবার জন্য মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে। অধুনা (এপ্রিল ১৯৯৮ ইং মাস) এই ধরনের ৬০ (ষাট) জন ভাল ও বুদ্ধিমান লোককে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য পাবনার হেমায়েত পুরের মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মহামান্য হাইকোর্ট তার 'সুয়োমোটো ক্ষমতায়' (কারো দরখাস্ত ছাড়াই কোন না কোন উৎস হতে খবর পেয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিচারক নিজে থেকেই) হাসপাতালের প্রতি রুলনিশি জারী করে ঐ ষাট জনকে পাগল হিসেবে ভর্তি করার জন্য কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বৈষয়িক অভাব অভিযোগ, সুবিধা অসুবিধা ও আইনসংগত স্বার্থ বৈষয়িক এবং

সংসারী মানষ মাত্রেই আছে; তা কেউ পীর পয়গম্বর হোন বা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, [পদ দুইটি শাসনতন্ত্রগতভাবে স্বার্থের পদ নয়, অনুচ্ছেদ ৫১ (৫) ও (৬)] সচিব, রাষ্ট্রপতিই হোন বা কোন খ্যাতিমান মানবই হোন। আইনের ছত্র ছায়ায় বা যুক্তিতর্কে কেউ সেই স্বার্থ আদায় করলে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে স্বার্থপর এবং দুর্নীতিবাজ বলাও মানহানিকর অপরাধ। কাজের সময় তিনি ভালভাবে কাজ করবেন, ত্যাগ স্বীকার করবেন এবং স্বার্থ আদায়ের সময় তা আদায় করবেন।

বর্তমান কালে যে কোন স্বার্থ ত্যাগকেই মানুষ দুর্বলতা স্বরূপ ধরে নেয়। দেওয়ানী আইনে সময় মত পাওনা সম্পত্তি আদায় করে দখলে না গেলে তামাদি আইনে সেই অধিকারও বেদখল হয়ে যায়। নিজের জমির আল বরাবর উপরের আকাশ এবং বর্ষায় ডুবে যাওয়া পানির নিচের জমির উপরও মালিকের পূর্ণ অধিকার। নিজের গাছ পালাকে ও ঘরের টিনকে ঢেকে বসা অন্যসীমানার ডালপালা হতে রক্ষা করা চুক্তি আইনে না হলেও টর্ট আইনে ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এতে ত্যাগ স্বীকার টর্ট আইনে দুর্বলতার সামিল। নিজের টিন ও ছাদ রক্ষা করা সহ অন্যের ডাল-পালাতে চাপা পড়া গাছকেও রক্ষা করার চিন্তা করতে হবে।

৫। অর্থ দন্ড ও কারাদন্ড একত্রে হলে অর্থদন্ড অনাদায়ে কি হবে?

অর্থ দন্ড ও কারাদন্ড একত্রে হলে অর্থদন্ড না দিতে পারলে কারাদন্ডের মেয়াদ বাড়বে, তবে মোট কারাদন্ডের মেয়াদের এক চতুর্থাংশের থেকে বেশী হবে না এবং কোন অবস্থাতেই ৬ মাসের বেশী হবে না; তবে কম হতে পারে। অর্থদন্ড বা জরিমানা মরে গেলেও মাফ হয় না। কারণ মৃতের তো সম্পত্তি থাকে এবং সেই সম্পত্তির ওয়ারিশও থাকে, তখন অর্থদন্ড তার সম্পত্তির ওয়ারিশদের শোধ করতে হয়। কোন সম্পত্তি না থাকলে রবিঠাকুরের ভাষায় বলা যায়ঃ "মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে" ইংরেজী প্রবাদে বলে "To pay the debt of nature" আত্মার খোরাকের জন্য অর্থ লাগে না। অর্থ দেহের কর্মশক্তি জোগায়। দেহই যখন মাটিতে মিশে গেল, পিপড়া ও পোকা-মাকড়ে খেলো, তখন ঋণের আর বাকী থাকলো কি? মরে গিয়ে দেহ পোকার খোরাক হওয়াটাইতো শাস্তি। দন্ডবিধির ধারা ৬৫ অনুযায়ী দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করতে হয়, তা না হলে অর্থ আদায়ের জন্য পিডিআর এ্যাক্ট (পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী এ্যাক্ট) এর সার্টিফিকেট মামলা তাদের বিরুদ্ধে চলবে এবং সম্পত্তি ক্রোক হবে। জরিমানা শাস্তি প্রদানের তারিখের ৬ বৎসরের ভিতর প্রদেয়। এর ভিতর মরে গেলেও তার পক্ষ থেকে ওয়ারিশদের শোধ করতে হবে।

৬। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে গুলি করলে পুলিশের কোন অপরাধ হবে কি না ঃ-

অনেক সময় নবীন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার গুলি ছোড়ার আদেশে সই করিয়ে নেয়। আগেই সাথে করে টাইপ করা কাগজ নিয়ে যায় বা সামনে যে কাগজ পায় তাতেই লিখে স্বাক্ষর নেয়। এটা উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার তদন্ত করে দেখার বিষয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে গুলি না করলে চলতো কিনা, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি দিয়েও বিক্ষুব্ধ জনতা ছত্রভংগ করা যেতো কিনা, এসব বিষয় অনুসন্ধান করে দেখা হয়। এফআর (এম/এফ) এবং এফআর (এম/এল) হতে পারে, ফাইনাল রিপোর্ট এ 'মিসটেক অব ল' আছে। 'মিসটেক অফ ল' থাকলে ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী হবেন কিন্তু 'মিসটেক অফ ফ্যাক্ট' থাকলে পুলিশ দোষী হবেন। তবে অভিপ্রায় সৎ থাকলে সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন বিচার বিভাগীয় মামলা শুরু করা যাবে না। দন্ডবিধি ৭৭ ও ৭৮ মোতাবেক মিসটেক অফ ফ্যাক্ট এর জন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৭ দিনের জেল দিলেন। আপীলে আসামী খালাস পেলো। তথ্য ভুল প্রমাণিত হলো। তবু ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন অপরাধ হবে না, কেননা ম্যাজিষ্ট্রেট সরল বিশ্বাসে ঐ সাজা দিয়েছেন। হয়তো কোন আইনে জুরিসডিকশান নাই, তবু ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী হবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদেশে গুলি করলে পুলিশের দোষ হবেনা। সমস্ত জবাবদিহিত্ব পড়বে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর।

ধরা যাক, ধারা ৭৮ অনুসারে গাজীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে নরসিংদীর আসামীকে ধরে আনলো। এতে পুলিশের দোষ হবে না, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ আছে বলে, যদিও জুরিসডিকশান (টেরিটোরিয়াল) এর বাইরে চলে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু যেতে হলে এক্ষেত্রে সিআই (বর্তমানে এ, এস, পি,) এর অনুমতি লাগে। এর মধ্যে আসামী থানার বাইরে চলে গেলেও ম্যাজিষ্ট্রেটের দোষ হবেনা, তিনি না বুঝে সরল বিশ্বাসে আদেশ দিয়েছেন বলে। কিন্তু অভিজ্ঞ পুলিশ র‍্যাংকে ছোট হলেও বিষয়টি পয়েন্ট আউট না করলে পরে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। ডাক্তারও যত্নসহকারে সরলবিশ্বাসে রোগী মরে যাবে জেনেও অস্ত্রোপচার করলে সরলবিশ্বাসে করেছেন বলে দোষী হবেন না। কিন্তু অন্য ডাক্তারের যোগসাজোশে ও চক্রান্তে কোন অপকর্ম করলে বা তদন্তে তা ধরা পড়লে দন্ডবিধিতে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পাগল আর প্রমত্ত ব্যক্তিরও দন্ডবিধিতে কোন অপরাধ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি পুলিশ দেখলে পাগলামি করে না, আবার অন্য সময় টাকা কেড়ে নিয়ে দৌড় দেয় বা পকেটে হাত দেয় সে পাগল হতে পারে না। আর সত্যিকারেই যদি কেউ পাগল হয় তবে পাগলামিটাই তার অপরাধের শাস্তি। পাগলের জীবনতো আর স্বাভাবিক হয় না, উলঙ্গ, খাওয়া-গোসল নেই, রাস্তায় খায়, ঘুমায়, কাউকে চিনে না, নিজের ঘরবাড়ী

বাসস্থান, ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পুত্র ৫,১০, ৫০,১০০ টাকার নোট ইত্যাদি যে কোনটাই চিনে না। সত্যিকার পাগল শাস্তিতেই আছে, আই দন্ডবিধিতে তাকে আর শাস্তি দেবার বিধান নাই। ভাল ও সুস্থ ব্যক্তিকে পাগল বললে মানহানিতে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবশ্য কেউ যদি আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেন বা জজ কোর্টের সেরেস্তাদের কোর্ট ফি দিয়ে দরখাস্ত করেন; উক্তিকারীর ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে; জরিমানাও হতে পারে।

৭। নিচে কতিপয় অপরাধ, তাদের ধারা, শাস্তির ধারা ও অন্যান্য অপরাধ হতে পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচিত হলো ঃ

৪৪১ ধারায় সম্পত্তিতে বে-আইনী অনুপ্রবেশ ও অবস্থান। অপরাধের উপাদান সমূহ হচ্ছে (ক) অন্যের সম্পতি (খতিয়ান নং ও দাগ নং দ্বারা চিহ্নিত কোন একটি থানার কোন একটি মৌজায়) তে প্রবেশ করতে হবে (খ) প্রকৃত মালিকের বিনা আমন্ত্রণে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবেশ করতে হবে (গ) কোন সম্পত্তিতে বে-আইনীভাবে অবস্থান করতে হবে (ঘ) সম্পত্তির মালিককে অপমান ("তোকে আবার দাম দিব কিরে" এই সমস্ত কথা উচ্চারণ করা), বিরক্তি (সম্পতির মালিকের মা বোনের দিকে বদনজরে চাওয়া) হুমকি ("তোর মত লোক আমি দিনে দুপুরে মেরে ফেলতে পারি" এই ধরনের কথা উচ্চারণ করা) ও ভীতি প্রদর্শন করা (যে যে পেশার মানুষ নয়, তার বাড়ীর আশে পাশের কোথাও অন্য পেশার দুর্ধর্ষ লোক-জন এনে মারামারি বা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য এনে বসিয়ে রাখা) এই ধরনের অপরাধীদের কাজকর্মকে 'ক্রিমিনাল ট্রেস পাস' বলা হয়ে থাকে। ৪৪২ ধারাতে আছে গৃহে অনধিকার প্রবেশ, ৪৪৪ ধারাতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে কারো চুরি করা, মেহমান বা কারো বাড়ীর শত্রু হিসাবে সংগোপনে গৃহে প্রবেশ করা (তাকে সামাজিকতার খাতিরে প্রত্যক্ষভাবে, ভদ্রতা রক্ষার জন্য লজ্জায় কিছু বলা যায় না), ৪৪৫ ধারাতে আছে সিঁদ কেটে বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ, ৪৪৬ ধারাতে রাত্রিতে গৃহভঙ্গ করে ক্রিমিনাল ট্রেসপাশ, ৪৪৭ ধারাতে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি ৩ (তিন) মাস সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড। ৪৪৮ ধারাতে ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দন্ড। অপরাধ সংঘটনের পর মামলার কোন সময়সীমা নাই। যখন যার উপর অপরাধ করা হয়েছে তার সামর্থ্য ও দক্ষতা যখন আসবে তখনও সে মামলা করতে পারবে।

৭ (১) অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ ঃ

দন্ডবিধির ৩৩৯ ধারা অবৈধ বাধা এবং ৩৪০ ধারা অবৈধ অবরোধ সম্পর্কে। কারো ভয়ে কোন লোক যদি কোন সরকারী জায়গার উপর দিয়ে না গিয়ে তার গতি পরিবর্তন করে, তা অবৈধ বাধা। কোন বেসরকারী রাস্তার (জল বা স্থল পথের বেলায়) ক্ষেত্রে এ দন্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না। তার জমি বা জলপথের উপর দিয়ে সে না-ও যেতে দিতে পারে। অবৈধ অবরোধ হচ্ছে চাকু বা লাঠি পুঁতে কাউকে বলা সেখানে বসে থাকতে, এক পাও কোন দিকে অগ্রসর না হতে দেওয়া, ৪ দিকের যে কোন দিকে। এটা দন্ডবিধির ৩৪০ মতে ফৌজদারী অপরাধ। আগেরটিতে অন্যদিক দিয়ে রাস্তা পার হয়ে চলে যেতে পারে গন্তব্যস্থলে। এইক্ষেত্রে কোন দিকে যেতে না দেওয়া। তবে পরিচয়ের অভাবে কেউ সরকারী লোককে এইরূপ আটকাতে চাইলে প্রথমে পরিচয় দিতে হবে, তারপর আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু অস্ত্র বা হাতে বল প্রয়োগ করতে হবে।

৩৪১ ধারায় অবৈধ বাধার শাস্তি হচ্ছে যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা (যে কোন অংকের পরিমাণে) অথাব উভযবিধ দন্ড। অবৈধ অবরোধের শাস্তি হচ্ছে ৩৪২ ধারায় ১ বৎসর মেয়াদের স্বশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড।

৭(২) সাধারণ উদ্দেশ্য, সাধারণ অভিপ্রায়

কমন অবজেক্ট বা সাধারণ উদ্দেশ্য বে-আইনী সমাবেশের (৫ বা ততোধিক লোকের সমাবেশ) সদস্য হিসাবে ১ জনে কোন অপরাধ করলেও সবাই দোষী হয়। এটা পুর্বপরিকল্পিত না হয়ে হঠাৎ হতে পারে, একজন কিছু করে বা বলে বসলেই সবাই দোষী, এখানে সবাইকে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কমন ইন্টেনশন বা সাধারণ অভিপ্রায়ে সবার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নাই। একজনে নীল নকশা বা ডিজাইন করে দিয়ে বা পরিকল্পনা করে দিয়ে দূরেও থাকতে পারে। কিন্তু কমন ইন্টেনশন এর জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তিও সমান দোষী হবে। শ্বশুর বাড়ী গেলে সরকারী চাকুরী পেশার জামাইকে ব্যবসায়ী শ্যালক, তাদের ছেলেরা ধরে মারলো, কেউ বাধা দিলনা। কেউ ঘুষি মারলো, কেউ লাথি মারলো, কেই থাপ্পড় মারলো, কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করলো, কেউ বটি দিয়ে কোপ দিল। যার আঘাতেই সেই ব্যক্তি মারা যাক, সবাই সমানভাবে দোষী হবে, হাজত খাটবে, জেল খাটবে ও ফাঁসির আসামী হবে। (কারো সাথে Aggrieved বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন ক্ষেদে কথা না বললেও) এবং রায়ের পর যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সে পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে থাকবে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার সঙ্গে ৩৪ ধারা যোগ হলে কোন

আপীল চলবে না।৩৪ ধারা সাধারণ অভিপ্রায় বা কমন ইন্টেনশন সম্পর্কে এবং ১৪৯ ধারা কমন অবজেক্ট বা সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ৩০২ ধারায় খুনের বা দিনে দুপুরে মেরে ফেলার বিচার হয়ে থাকে। কোলকাতা কোর্টের ১৯৭নং মামলাই এর নজির। মামলাটির নাম বরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম কিং ইম্পেরার আই এল আর, ৫২ ক্যাল ১৯৭। বরেন্দ্র কামুর পোষ্ট মাষ্টার বা একজন সরকারী কর্মচারীকে মারতে গেলে বরেন্দ্রের চামচা দুইজন পোষ্ট মাষ্টারকে দুইটি গুলি করে। তাতে বরেন্দ্রের মৃত্যু দন্ড হয়। তারপর ৫জন বিচারকের বেঞ্চে পাঠালে হাইকোর্টে উক্ত সাজা বহাল রাখা হয়। তারপর বহু টাকা খরচ করে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে পাঠালেও হিজ এক্সেলেন্সী লর্ড চেন্সেলর রায়টি বহাল রাখেন এবং বরেন্দ্রের ফাঁসি হয়ে যায় এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে থাকে। কোটি কোটি টাকা খরচও তাকে বাঁচাতে পারেনি। জুরীগণ যারা ঘটনার বিশ্লেষণ করেন, আইনের নয়, তারাও জজের সংগে একমত ছিলেন। এক কোর্টের রায় অন্য কোর্টেও নজির বা প্রিসিডেন্স হিসাবে ব্যবহার চলে। রায় ও একমতই হয় (Obiter Dicta বা Precedence) বিচার্য বিষয়, সিদ্ধান্তের কারণ রায়ে উল্লেখ থাকে। এটাই দিনে দুপুরে খুনের পরিণতি। গুলি না করেও চামচাদের হাতে কাজ করেও ফাঁসিতে যেতে হয়।

প্ররোচনা বা এ্যাবেটমেন্ট এর ক্ষেত্রে অপরাধ দন্ডবিধির ১০৭ ধারায়, আত্মরক্ষার অধিকার সম্পর্কে ৯৬-১০৬ ধারা পর্যন্ত বলা আছে। আত্মরক্ষার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো সম্পর্কে বলা আছে ১০৩ হতে ১০৬ ধারায়। আত্মরক্ষার অধিকার শুরু হয় আক্রমনের মুহুর্ত হতে এবং শেষ হয় আক্রমণ শেষ হবার পরেই। অনেকদিন পর অন্যস্থানে যখন আক্রমণ নাই, তখন আত্মরক্ষার অধিকারের অজুহাতে কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। এটি ১০২ ধারা।

৯৬ ধারা বলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার জন্য কোন কার্যই অপরাধ নয়, ৯৭ ধারা বলে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার সবার আছে। ৯৮ ধারা অপরিণত বুদ্ধি, অসুস্থব্যক্তি, অল্প বয়স্ক, নেশাগ্রস্থ, বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

৭ (৫) মৃত্যু ও গুরুতর জখমের ক্ষেত্র ব্যতিত সরকারী কর্মচারীর সরল বিশ্বাসের অন্যায় কাজের সময় ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োগ করা যাবে না। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু ক্ষতিসাধন দরকার ততটুকুই ক্ষতিসাধন করতে হবে। বেশী করলে অপরাধ হবে। কেউ বটী দিয়ে কোপ দিতে এলে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বটী হাত ছাড়া করা যাবে। সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে আক্রমণকারীর ধারণা না থাকলে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার উপর শারীরিক বল প্রয়োগ করা যাবে কর্তব্যরত অবস্থায়।

৭ (৬) দন্ডবিধি ১০০ ধারা মোতাবেক দেহগত আত্মরক্ষার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় ঃ (ক) মৃত্যুর আশংকার ক্ষেত্রে (খ) গুরুতর আঘাতের আশংকার ক্ষেত্রে (গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণের ক্ষেত্রে (ঘ) অস্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ (ঙ) শিশু বা নারীহরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (চ) অবৈধ আটক করার উদ্দেশ্যে হামলা।

৭(৭) মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকলে মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন ক্ষতি করা যায়, এটি ১০১ ধারা। ১০৩ ধারায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো অপরাধ নয়, (ক) দস্যুতার ক্ষেত্রে (খ) রাত্রিকালে গৃহভংগ (গ) অগ্নি সংযোগ দ্বারা ক্ষতির ক্ষেত্রে (ঘ) মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে।

৮। চুরি ও ছিনতাই

যদি কোন সময় কারো দখল হতে তার সম্মতি ব্যতীত কোন অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছায় অসৎ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করার জন্য এক স্থান থেকে কেউ অন্য স্থানে স্থানান্তর করে, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হবে। কুরআন শরীফে চুরির শাস্তির কথা বলা থাকলেও চুরি কাকে বলে তা বলা নাই। এখানে বলা আছে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য চুরি করে দৌড়ে পালাবার সময় যে পর্যন্ত তাকে দেখা যায় সে পর্যন্ত পায়ে গুলি করা যাবে সম্পত্তি রক্ষার অধিকারে। পরে গুলি করা যাবে না বা মারা যাবে না। স্থানান্তর না করলে চুরি হবে না। অসৎ উদ্দেশ্যে না হলে চুরি হবে না। ভবিষ্যতে নিজের অংশীদারিত্বের মাল হলেও চুরি হবে না (মোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে নজির আছে)। ভাইয়ের জলসেচের দোন একগ্রামে পড়ে থাকতে দেখে সদুদ্দেশ্যে ভাইকে তা বাড়ীতে পৌছে দেবার জন্য নিয়ে গেলে সেটিও চুরি হবে না। পথের কুড়ানো জিনিস কারো দখলের জিনিস না হলে তা চুরি হবেনা, তবে হাতের আংটিতে পরিচিত নাম লেখা থাকলে তা তাকে পৌছে না দিলে বা নাম লেখা মানিব্যাগ পরিচিত স্থানে পৌছে না দিলে অপরাধমূলক আত্মসাৎ করলে তার নাম হবে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ। কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আগের অভিজ্ঞতা না থাকলে তাকে অসুস্থ, সংজ্ঞাহীন বা উন্মাদ বা টোটালী ইনসেন্স মনে করে চুরির অপরাধ অবুঝ শিশুর মতই মাফ করে দেবার নজির আছে। এটা উচ্চ আদালতের নজিরে পরিদৃষ্ট হয়েছে। কোন ষড়যন্ত্রমূলক বড়শীর আধারের (টোপ) মত জিনিস খাওয়াও ইনসেনিটি, এর পিছনের রাজনীতি কার্যক্রম, চালাকী, দূর্নীতি ইত্যাদিও আগে বুঝতে হবে। যে না বুঝবে তার বেলায় তা চুরির অপরাধে গণ্য হবে

না। যেখানে কোন শারীরিক কাজ বা আর্থিক বা মানসিক কনট্রিবিউশন নাই, সেখানকার কিছু খাওয়াই বড়শীর আধার টোপ, এটা যে না বুঝে সেই ইনসেল।

দন্ডবিধির ৩৮৩ ধারাতে আছে বলপূর্বক বা প্রলুব্ধ করে ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি বা মূল্যবান দলিল বা সীল ছিনতাই এর ঘটনা। ৩৭৮ ধারায় সাধারণ চুরির অপরাধ সংঘটিত হয়। ৩৭৯ ও ৩৮০ ধারাতে চুরির শাস্তির বিষয় উল্লেখ আছে। ৩৭৯ ধারাতে ৩ বৎসর এবং ৩৮০ ধারাতে ৭ বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান আছে। ৩৮৩ ধারায় বলপূর্বক অপরাধের জন্য ও ৩ বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, কিন্তু গুরুতর আঘাতের জন্য ১০বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড হতে পারে। এটি সর্বোচ্চ দন্ড। সর্বনিম্ন দন্ড হাকিমের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তিনি যদি মনে করেন অপরাধী খুবই আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ, তিনি সর্বনিম্ন ১ দিনের কারাদন্ডও শাস্তি দিতে পারেন।

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন দস্যুতা সংঘটিত হলে তাকে ডাকাতি হিসাবে আখ্যা দেয়া যায়। এটি একটি যৌথ অপরাধ। এর ধারা ৩৯১। ৩৯০ ধারায় হয় দুস্যতা। সকল ডাকাতিতেই চুরি ও দস্যুতা আছে। সদস্য ৫ বা ততোধিক হলেই তা ডাকাতি, কম হলে দস্যুতা।

সকল দস্যুতা বা Robbery চুরি ও বলপূর্বক সম্পত্তি গ্রহণ হয়। ৩৭৮ধারায় চুরি এবং ৩৯০ ধারায় দস্যুতা বা রাহাজানি সংঘটিত হয়। ৩৫৯ হতে ৩৬১ ধারা কিডন্যাপিং এবং ৩৬২ ধারা এ্যাবডাকশন সম্পর্কে। কিডন্যাপিং হচ্ছে বলপূর্বক অপহরণ, এ্যাবডাকশন হচ্ছে প্রতারণামূলক অপহরণ। কিডন্যাপিং দুই প্রকার। বাংলাদেশ হতে অপহরণ (তখন দেশের দায়িত্ব উদ্ধার করার) এবং আইনানুগ অভিভাবক হতে সম্মতি ব্যতীত অপহরণ। বর্তমানে বালকের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ বছরের কম বয়স্ক এবং বালিকার ক্ষেত্রে ২১ বছর বয়স্কা (অন্য তথ্যে আছে বালক ১৪, নাবালিকা ১৬ বছর বয়সের)।

৯। এ্যাবডাকশন ও কিডন্যাপিং

এ্যাবডাকশন বা প্রতারণামূলক অপহরণ। কিডন্যাপিং এ অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি বিবেচিত হবে না। সে নাবালক, হাবাগোবাও হতে পারে। এ্যাবডাকশন এ অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি থাকলে আদালতে তা বিবেচনা যোগ্য। একজন বৃদ্ধ লোককেও এ্যাবডাকশন করা যায়। কিডন্যাপিং এর ক্ষেত্রে বিকৃতমস্তিষ্ক নাবালক ইত্যাদিও হতে পারে। কিডন্যাপিং মূল অপরাধ। এ্যাবডাকশন সাহায্যকারী অপরাধ।এর পর তাকে

ধর্ষণ, হত্যা তার স্বাক্ষর গ্রহণ, ইত্যাদিও হতে পারে। ৩৬৩ ধারাতে কিডন্যাপিং এর শাস্তি ৭ বৎসর কারাদন্ড (সশ্রম বা বিনাশ্রম)। এ্যাবডাকশন মূল অপরাধ নয়। ছেড়ে দিলে এবং অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি প্রমাণিত হলে অপহৃত ব্যক্তির মুখজবানী অনুসারে বা ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ ধর্ষণই হয়েছে, হত্যাই করেছে না অন্য কিছু। ৩৬৪ ধারামতে খুন করার উদ্দেশ্যে উঠিয়ে নিয়ে গেলে, দোস্ত দিয়ে প্রতারণা করে, লোভ দেখিয়ে, শাস্তি ১০ বৎসর কারাদন্ড হতে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডও হতে পারে। সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে কোন আঘাত করে বা অন্যভাবে হত্যা করাই খুন এবং দন্ডবিধিতে এটি ৩০০ ধারা কিন্তু 'ক্যালপ্যাবল হমোসাইড' বা অপরাধজনক নরহত্যা বা নিম্নখুন দন্ডবিধির ২৯৯ ধারা। এতে খুনের পূর্বপরিকল্পনা নাই কিন্তু আঘাত অতিমাত্রায় হওয়াতে বা ঘটনা বেসামাল হওয়াতে খুন হয়ে যায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইকবাল যৌন অপরাধ করার পরে সালেহাকে সামলাতে পারলে খুন করতো না, এটিই নিম্নখুন বা অপরিকল্পিত খুন "Calpable Homocide : All Murders are culpable homocide but all culpable homocides are not murders" বা সব খুনই অপরাধজনক নরহত্যা কিন্তু সব অপরাধজনক নর হত্যাই খুন নয়। ৩০৪ ধারানুসারে অপরাধজনক নরহত্যার শাস্তি ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড হতে পারে। কিন্তু ৩০২ ধারানুসারে খুনের অপরাধে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড হতে পারে।

১০। আঘাত সংক্রান্ত ধারা

এটি দন্ডবিধির ধারা-৩১৯। গুরুতর আঘাত করলে ১ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড হয় (স্বেচ্ছায় যদি আঘাত করে, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করলে নয়)। ৩২৫ ধারায় ইচ্ছাকৃত গুরুতর আঘাতের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে এবং তা হলো ৭ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম ও বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড। নিম্নলিখিত অপরাধগুলো গুরুতর আঘাত ঃ
(১) পুরুষত্বহীন করা (২) স্থায়ীভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করা (৩) স্থায়ীভাবে কর্ণের শ্রবণশক্তি বিনষ্ট করা (৪) যে কোন অঙ্গের বা গ্রন্থির অনিষ্ট, বিকৃতি বা ক্ষতিসাধন করা (৫) অঙ্গ বা গ্রন্থির শক্তি স্থায়ীভাবে বিনাশ বা পঙ্গু করা (৬) মাথা বা মুখ মন্ডলের বিকৃতি ঘটানো (৭) হাড় ও দন্ত ভাঙ্গা বা স্থানচ্যুত করা (৮) যে আঘাত জীবন বিপন্ন বা দুর্ভোগের সৃষ্টি করে, যে আঘাত ২০দিন পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা দেয় বা স্বাভাবিক কাজকর্ম করে খেতে দেয় না, হাসপাতালে রাখে, তাই গুরুতর আঘাত।

১১। ধর্ষণ ও ব্যভিচার

দন্ডবিধির ভাষায় ধর্ষণ (Rape) ও ব্যভিচার (Adultry) দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ। ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে ৩৭৫ ধারা এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ৪৯৭ ধারা মূলে দন্ড প্রদান করা হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয় ঃ

ক) কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনাচার করলে

খ) মহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে যৌনাচার করলে

গ) প্রতারণার মাধ্যমে মহিলার সম্মতি আদায় করলে (যেমনঃ বিবাহের আশ্বাস, দেবতা/চন্দ্র/সূর্য স্বাক্ষী রেখে নিভৃতে বিবাহের ভাণ করলে, প্রভৃতি ক্ষেত্রে)

ঘ) ১৪ বছরের কম বয়সী কোন কিশোরীর সঙ্গে যৌনাচার করলে এতে কিশোরীর সম্মতি থাকলেও কিংবা বেশ্যা বাড়ীতে অর্থের বিনিময়ে হলেও তা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। এমনকি ১৪ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসও ধর্ষণ বলে গণ্য।

ঙ) স্ত্রীর সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌনাচার (যেমনঃ পুং মৈথুন, পাশবিক সঙ্গম, প্রভৃতি) করলে। এখানে উল্লেখ্য যে, বেশ্যাবৃত্তি বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী আইনের দ্বারা স্বীকৃত নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করে বেশ্যাবৃত্তির অনুমতি গ্রহণ আইনসিদ্ধ নয় (যদিও তা কখনও কখনও করা হয়ে থাকে)।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রসমূহ কিছুটা ভিন্ন ধরনের, যদিও তা প্রকারান্তরে ধর্ষণেরই প্রকার বিশেষ।

ব্যভিচারের ক্ষেত্র নিম্নরূপ ঃ

ক) স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর যৌনাচার

খ) স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক অন্য কোন পুরুষ দ্বারা স্বীয় স্ত্রীকে যৌনকর্মে লিপ্ত করণ।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে যদি অন্য কোন পুরুষকে এরূপ যৌনাচারের সুযোগ প্রদান করা হয়, তাহলে তা ইউরোপীয় দেশসমূহে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হয়না। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এটিও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

৩৭৬ ধারানুসারে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড প্রযোজ্য হয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ৪৯৭ ধারানুসারে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড দেয়া যেতে পারে।

১২। মানহানি

মানহানীর ধারা ৫০০ এবং ৫০১। কোন মহিলার স্বামী যদি কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দাঁড় করায় এবং মহিলাটি যদি আত্ম সন্মান রক্ষার জন্য ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে (ধর্ষণকারীর মহব্বতে নয়) তখন যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে সে মানহানির মামলা করতে পারে, তখন মামলা দায়েরকারী বা অভিযোগকারী স্বামীর মানহানির অভিযোগে দীর্ঘ মেয়াদী কারাভোগের (৭ বৎসর) প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি অর্থদন্ডও হতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ না করতে পারলে মানহানির মামলায় ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে; দেওয়ানী আদালতে সত্য প্রকাশের জন্য কারো মেয়ে বিয়ে না হলে বা মেয়ের বিয়ে নষ্ট হলে ইত্যাদি। ফৌজদারী মামলায় ঘটনা প্রমাণ করতে পারলে কোন চিন্তার কারণ নেই।

১৩। এ্যাডভোকেটদের বার কাউন্সিলের মত সাংবাদিকদের প্রেস কাউন্সিল আছে। দেশ, দশ ও সমাজের মানুষের জন্য এ্যাডভোকেটদের মত সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব আছে। কোন সাংবাদিক কারো পক্ষে মানহানির কথা লিখতে যাচ্ছে জানলে লেখার বিরুদ্ধেও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা ইনজাংশন জারীর ব্যবস্থা করা যায়। তারা অন্যায় করলে বার কাউন্সিলের মত তাদের বিরুদ্ধেও সাসপেনশন বা ডিসমিজাল ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যায়। তাই সাংবাদিকতা নিরপেক্ষ ও ন্যায়নীতিভিত্তিক হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আইন আদালত কোর্ট কাচারী বা সাংবাদিকদের কাছে যে তথ্য নেই, সরকার, রাষ্টপতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন কমনওলেথ, প্রিভি কাউন্সিল, লর্ড চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাণী'র নিকট সে তথ্য থাকতে পারে। তাই এঁদের সুপারিশে মৃত্যুদন্ডের আসামীও খালাস প্রাপ্ত হতে পারে। দেশের ইতিহাসের বহু পুরানো ঘটনা ও বিশ্লেষণ আইন আদালত ও সাংবাদিকতায় আসল সিদ্ধান্ত বা নিরপেক্ষ রায় প্রদানের জন্য প্রয়োজন। যে সমস্ত তথ্য ও আইনকানুন ও ঘটনার সাক্ষী বা দলিল খুবই দুস্প্রাপ্য, প্রতারণার সম্ভাবনাই সেক্ষেত্রে বেশী, এই সম্পর্কেও দন্ডবিধিতে বিধান আছে।

১৪। সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য এবং সকল কর্মচারীদের অবশ্য জ্ঞাতব্য দন্ডবিধির কতিপয় ধারা এতদসঙ্গে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

দন্ডবিধিতে ঘুষকে বলা হয় গ্রাটিফিকেশন। ১৬১ ধারামতে নিজ হাতে ঘুষ নেওয়া ও ১৬২ ধারাতে পিওন বা দালালের হাতে ঘুষ নেওয়া, ১৬৩ ধারাতে গণপ্রতিনিধি কর্তৃক

প্রভাব খাটিয়ে জনসেবা করে দিয়ে বিনিময়ে কিছু নেওয়া, ১৬৪ ধারা প্রলুব্ধকারী বা গুন্ডা দিয়ে কোন মারপিট করানো বা হত্যা করানো। ১৬৩ ধারার অপরাধ বিনাশ্রম কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড। ১৬৫ ধারাতে ব্যবসায়ের জন্য আট হাজার টাকার টিভি দুই হাজারে দেওয়াও ভ্যালুয়েবুল জিনিষ কমদামে নেওয়ার জন্য উপহার গ্রহণের সামিল অপরাধ। ১৬৬ ধারা ন্যায্য পাওনার চেয়ে কম দেওয়া। দলিল কম দামে রেজিস্ট্রী করা হাকিমের অপরাধ (হাকিম অর্থ সাব রেজিষ্ট্রার)। ১৬৭ ধারায় কারো স্বার্থ বিরোধী ইচ্ছাকৃত ভুল করে দলিল নকল করাবার অপরাধ। ধারা ১৬৮ স্বনামে বা বেনামে সরকারী কর্মচারীর নিলাম ডাকার অপরাধ (নিজ অফিসের আওতাধীন মাল বা হাট বাজার, বাগান বা ব্যবসায়ের)। ধারা ১৬৯ নিলামের দাম বাড়াবার জন্য সরকারী কর্মচারীর নিলাম ডাকার অপরাধ। ১৭০ ধারা ভুয়া ছাপ লাগিয়ে এ্যাকশনে গেলে ২ বৎসর কারাদন্ড, এ্যাকশনে না গেলে নয়। ১৭১ ধারা ভূয়া ছাপে দাম বাড়ালে তিনমাস কারাদন্ড। ধারা ১৭৯ সরকারী কর্মচারীর (পেশাগত কাজে প্রশ্ন করলে) প্রশ্নের জবাব না দেয়ার বা তথ্য না দেবার জন্য অপরাধ। ধারা ১৮৬ সরকারী কর্মচারীকে তার কাজে বাধা দেয়ার অপরাধ। ধারা ১৮৯ সরকারী কর্মচারীকে ভয় দেখানোর অপরাধ। ৩২৩ ও ৩২৫ ধারা আঘাত ও গুরুতর আঘাতের অপরাধ। এন্টিকরাপশন আইনের ৫ ধারাতে দুর্নীতির শাস্তি। নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও সচিবের অনুমতি নিয়ে তদন্ত করতে হবে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ভূয়া প্রমাণিত হলে এবং দুর্নীতিবাজ হলে তাদের দিয়ে কাজ করানোটাইতো বিপদজনক। সরষেতে ভূত থাকলে এবং ওঝাকে সাপে কাটলে ভূত তাড়ানো এবং বিষ নামানোটাইতো হবে অসম্ভব ব্যাপার।

১৩। বাংলাদেশে আরোপযোগ্য বিধির পর্যালোচনা

ব্রিটিশ আমলে দন্ডবিধি যে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ২০ বৎসর পর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এখন এর কার্যকারিতার কোন সময়সীমা নেই। অপরাধ সংঘটিত হবার ১০০ বছর পরও তদন্ত কার্য শেষে সাক্ষী সাবুদে প্রমাণিত হলে অপরাধীর শাস্তি হতে পারে। সময়ের বিবর্তনে কমজোর পার্টি ক্ষমতায় এসে তাদের সদস্যদের উপর ঘটিত অবিচারের প্রতিশোধ নিতে পারে। বিচারের অন্যান্য উদ্দেশ্যের ভিতরে সংশোধন, প্রতিশোধ এবং অপরাধটি যাতে আর না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও জড়িত। নাবালক সন্তান বড় হয়ে তার পিতার প্রতি কৃত অবিচারের ও প্রতিশোধ এইভাবে নিতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্য দাঁড় করিয়ে নিরপরাধকেও অনেক সময় শাস্তি দেয়া হয়, তাকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করানো সম্ভবপর না হলে। সমাজের বিভিন্ন যুগে এসব ঘটনাও ঘটে। তাই ব্রিটিশ আমলের ২০ বছরের

পরিবর্তে এখন দন্ডবিধির কার্যকারিতার সময় সীমার চৌহদ্দী উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে কোন লোক যদি সময়ের বিবর্তনে নিযামুদ্দিনের মত আউলিয়াও হয়ে যায়, তবু তার বিরুদ্ধে অতীতে করা অপরাধের জন্য যদি কেউ বাদী হয়ে আদালতে মামলা রুজু করে এবং সেই অপরাধ যদি সাক্ষী সাবুদে প্রমাণ করা যায় এবং অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় সমন ওয়ারেন্ট ক্রোকী পরোয়ানা বা হুলিয়া দিয়ে আদালতে হাজির করে বিচার করা যায়, তখনও তার কৃতকর্মের বিচার শতবর্ষ পরেও চলতে পারে এবং অপরাধীর শাস্তি হতে পারে। পাপীকে শাস্তি পেতে হবেই এটা বর্তমান অবস্থায় দন্ডবিধি কার্যকর করার নীতি। বর্তমান সমাজে সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য মানুষ পশুর মত আচরণ করে বলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দন্ডবিধি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রের ভিতরই দন্ডবিধি কার্যকর বলে এটাকে বাংলাদেশ দন্ডবিধি বলা হয়ে তাকে, যদিও মূল দন্ডবিধি ব্রিটিশদের দ্বারা প্রণীত এবং তা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই প্রযোজ্য। আমেরিকার দন্ডবিধি বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না; এমনকি ওখানকার ব্যবস্থার কথা আমাদের মত সমাজে মুখে পর্যন্ত উচ্চারণ করা যাবে না। হোমোসেক্সচুয়ালিটি সম্পর্কে আমেরিকায় নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে সমাজের ডিমান্ড-এ হস্তক্ষেপ না করার জন্য এবং অতীতের অপরাধ ধরে বর্তমানে বিচার কার্যকর না করার জন্য। অতীতে যে পরাজিত বর্তমানে সে বিজয়ীও হতে পারে। বর্তমানে বিজয়ী হয়ে সাক্ষী সাবুদে অতীতের কোন অপরাধ প্রমাণিত করে বর্তমানে বিচার দাঁড় করানো যাবে না; শাস্তিও দেয়া যাবে না।

অপরাধ অনেক অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যে অবস্থায়ই সংঘটিত হোক না কেন প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারের রায়ে অপরাধের জন্য শাস্তি হবেই। শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীল করেন তখন অবস্থার বিশ্লেষণে তিনি মুক্তি পেতেও পারেন। দশজনের সাথে তিনিও যদি এক বোঝা কলাই নেন, দশজন মুক্তি পেয়ে গেল তিনি তখন সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পেয়ে যেতেও পারেন। অপরাধের বিরুদ্ধে হেদায়েত করতে করতে, বাধা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত কথা মানাতে না পেরে কেউ নিজেও সেই অপরাধের চেষ্টা করে বসলেন। অপরাধের চেষ্টা করাও অপরাধ। তখন অপরাধ করলে যে শাস্তি, চেষ্টার জন্য তার অর্ধেক শাস্তি হবে। কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার হাত ধরে তাকে সাহায্য করে থাকেন, কোন কাজ করতে অথবা আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে থাকেন বা সেক্সবিহীন মন নিয়ে মুখে চুমু খেয়ে থাকেন, তা প্রাথমিক পর্যায়ে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হলেও আপীলের বিচারে অবস্থা বিশ্লেষণে তিনি মুক্তি পাবেন। কেউ যদি ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে অপরাধীকে

অপরাধ হতে সরাতে না পেরে অথবা নিরপরাধকেও সন্দেহে অপরাধী মনে করে তার উপর অপরাধ করার চেষ্টা নেন, আপীলের বিচারে তিনিও মুক্তি পেতে পারেন। সুতরাং কারো উপর দন্ডবিধি আরোপের সময় এসব দিকে লক্ষ্য রাখা সুবিচারের স্বার্থে একান্ত দরকার। অপরাধটি স্বতস্ফুর্ত ভাবেই করা হলো, না ষড়যন্ত্র করে অবস্থার শিকারের উপর ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার মত অবস্থায় করানো হলো, সেটাও ধর্তব্য বিষয়। অবস্থার বিচ্যরে এসব ক্ষেত্রেও অপরাধী মুক্তি পেতে পারে। "দোয়াতের ভিতর কলম; "সূচের ভিতর সুতা" এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েই জুরীর বিচারে আগে ব্যভিচার, ধর্ষণের অপরাধ প্রমাণ করানো হতো। যদি বাইরে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, তাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে তার একটু হাল্কা শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো, যদি আদালতে বিচার প্রার্থী হয়ে সাক্ষী সাবুদে তা প্রমাণ করানো যেতো। তেমনি বিবেচক অনুপ্রবেশকারীর এবং বেপরোয়া ভোগসম্ভোগের রায়ও হয় ভিন্ন ধরনের। বিষয়টি একতরফা না দুই তরফা। কোন বিনিময় গ্রহণ করা হয়েছে বা ভোগ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদিও ধর্তব্য বিষয়। কোন রাজনৈতিক অধিক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এসব করানো হচ্ছে কিনা এসবও তদন্তের বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঁচার অধিকারে শাসনতান্ত্রিক মানবাধিকারের দাবী সবারই আছে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক দৃষ্টিও তদন্তের বিষয় হতে পারে।

১৫। উপসংহার

'রোমান ল' মুসলিম ল'তে সংশোধিত হয়ে পরবর্তীকালে নেপোলিয়ানিক কোডে (আইনের সমষ্টিই কোড) পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ ল'তে আধুনিকরূপ লাভ করে। কোলকাতা, বোম্বে (বর্তমানে মোম্বাই) ও মাদ্রাজ প্রেসিডিসিতে কিছু কিছু সংশোধিত ব্রিটিশ আইন কার্যকরী হলেও অত্র উপ-মহাদেশে সিপাহী বিপ্লবের পরে দন্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্যধারা পুরোপুরি কার্যকরী হয়।মেকলে সাহেব সহ বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ আইনের বইগুলি সম্পাদনা করেন। আপীল করতে হতো লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড চ্যান্সেলরের কাছেই। রোমান ল'তে চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড এবং কাজের মেয়ে বা ছেলের সাথে ধর্ষণে লিপ্ত হলে অতি উপরের স্তরের মানুষকেও কাজের মেয়ে বা ছেলের স্তরে নামিয়ে দেয়া হতো। তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে তাদের স'থে চলতে হতো রাজনীতি করতে হতো। মুসলিম ল'তে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেয়া এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ ল'তে এটি আরো সংশোধিত ও লিবার‍্যাল হয়। অতি অভাবেই মানুষ কাজ না পেলে চুরি করে, ইত্যাদি বিবেচনা করে চোরের গায়ে হাত না দেয়ার আইন তৈরী হয় এবং চোর চুরির সময় যতটুকু আঘাত করেছিল তার

চাইতে বেশী আঘাত না করার আইন তৈরী হয়। চোরকে চোর বলে অপমানিত না করার Precedence প্রবর্তিত হয়।

অবস্থার সংগে এবং সামাজিক অবক্ষয়ের সংগে খাপ খাইয়ে আমাদের আইন কানুন এখন সংশোধিত হওয়া উচিত। ভারতে কিছু কিছু সংশোধিত হলেও আমরা এখনো ব্রিটিশদের তৈরী করা আইনই অনুসরণ করে যাচ্ছি। মানুষ যখন সামনে অগ্রসর হয়, কিন্তু আইন পিছনে পড়ে থাকে, তখনি মানুষ বিপ্লব করে। আমাদের শান্তি এবং জানমাল ইজ্জত রক্ষার স্বার্থে আমাদের দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যধারা, দেওয়ানী আইন, চুক্তি আইন, টর্ট আইন, কোম্পানী এ্যাক্ট ইত্যাদি সংশোধিত হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্বলের উপর যেন সবলের অত্যাচার না বাড়ে সেদিকে আইন প্রণয়ন কারীদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। রহমান, শামসুর গাজী, (১৯৮৮) *দন্ডবিধির ভাষ্য ,তৃতীয় সংস্করণ,* খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১।

২। Prof. Khan, A, A. *The Bangladesh Penal Code.* Publisher Khushroz Kitab Mahal, 15 Bangla Bazar, Dhaka-1.

৩। অধ্যাপক খান এ, এ, *চুক্তি আইন ও টর্ট,* কামরুল বুক হাউজ, ৪৬নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৪। অধ্যাপক খান এ, এ, *দেওয়ানী আইন ও তামাদি আইন,* কামরুল বুক হাউজ, ৪৬ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৫। অধ্যাপক খান এ, এ,*(১৯৮৬), ফৌজদারী কার্যবিধি* কামরুল বুক হাউজ, ৪৬ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৬। *বাংলাদেশের সংবিধান* (অনুচ্ছেদ ৫১ এর (৫) ও (৬

বস্তি উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সমাধান (বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত)

সৈয়দ শামসুল আলম *

১.০ ভূমিকা

একজন কর্মক্ষম মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার কর্মসংস্থান। গ্রামের তুলনায় শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হওয়ায় শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে কাজের জন্য শহরে ছুটে আসে। বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। এখানে একমাত্র কৃষি, ক্ষুদ্র পেশা ও কুটির শিল্প ছাড়া তেমন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় মানুষ প্রতিদিন গ্রামাঞ্চল থেকে কাজের অন্বেষণে স্রোতের মত শহর অভিমুখে ছুটে আসে।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে গ্রাম থেকে দিনমজুর, ক্ষুদ্র পেশার মানুষ, এমনকি ছোট কৃষক পরিবার; যে তার আয়ের অর্থ দ্বারা সংসার চালাতে ব্যর্থ হয়, সে মানুষটিও একসময় গ্রাম ছেড়ে পরিবারসহ কাজের অন্বেষণে শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়।

প্রাণরক্ষার দায়ে এবং একটু উন্নত জীবন যাপন ও কর্মসংস্থানের তাগিদে গ্রাম থেকে মানুষের শহরে আসার ঘটনা নতুন নয়। নগরায়ন বৃদ্ধি পাবার পর থেকে বৎসরের পর বৎসর এই প্রবণতা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, একবার যারা সবকিছু ছেড়ে শহরে এসে পড়ে, গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অসহায়, সম্বলহীন এই মানুষগুলো শহরে এসে প্রথমে রেলস্টেশনে, পরে ফুটপাতের পাশে একটি খালি জায়গায় অথবা পতিত জায়গায় মাথা গোঁজার জন্য একটি অতি সাধারণ ঝুপড়ি তৈরী করে শুরু করে বস্তিবাসী জীবন।

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

কিন্তু শহরে এসে প্রথমেই এ মানুষগুলো যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে তা যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। শহরেও কাজ নেই, থাকার জায়গা নেই, আহার সংগ্রহের উপায় নেই। অবস্থাটি এমন যে, গ্রাম তাদের ধরে রাখতে পারেনি, শহরও তাদের ধরে রাখতে চায়না। গ্রাম থেকে আসা এই ছিন্নমূল মানুষের জীবন নিয়ে এই যে বিড়ম্বনা, এই যে, অসহায়ত্ব তার স্বরূপ বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে শহরে বস্তি সৃষ্টির প্রধান কারণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বস্তি সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক ভাবে যে সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে বা এখনও অব্যাহত রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে; বিশেষ করে ঢাকাসহ প্রধান চারটি মহানগরীর বস্তি সমস্যা এবং এর প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে এই সমস্যা নিরসন কল্পে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নে সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী ও আধা সরকারী গবেষণা প্রতিবেদন থেকে তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে।

২.০ শহরে বস্তি

(ক) বস্তি ঃ সৃষ্টির কারণ

বিশ্ব নগরায়নের অগ্রগতি ১৯৯৪ (World Urbanization Prospect : 1994) শীর্ষক জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "The number of people who live in urban areas expected to double to more than 5 billion people between 1990 to 2025. 90 percent of this growth will occur in the countries of developing world" এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, "Roughly 1,50,000 people are added to the urban population of developing countries every day" এই বিপুল সংখ্যক লোক শহরে এসে তাদের আর্থিক সংগতি মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে থাকে।

যে সকল কারণে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হচ্ছে এবং শহরে বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত কারণসমূহ অন্যতম ঃ

শহরগুলো গ্রামের মানুষকে তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক ও আর্থিক সুযোগ প্রদান করে থাকে। "Cities are growing because they provide, on average, greater social and economic benefits than do rural areas" একই সাথে খাবারের পানি, স্বাস্থ্য সুবিধা, পয়ঃপ্রণালী, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সুযোগ মানুষকে শহরমুখী করেছে। যদিও এই সুযোগগুলো বস্তিবাসীদের মধ্যে নেই বললেই চলে।

তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে রয়েছে ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করার সুবিধা। সম্প্রতি বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে মহিলাদের কাজের সুযোগ গ্রামের গরীব ও নিম্নবিত্ত মহিলাদের পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শহরমুখী করে তুলেছে। এই সুযোগ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইনফরমাল সেক্টরে যে কোন রকম ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত হচেছ। এলজিইডির একটি সীমক্ষায় দেখা গেছে, "A substantial number of Bangladeshi's urban poor make their living through subsistence activities or informal jobs such as garbage collection, domestic help and other odd jobs. Informal jobs makeup an estimated 75 percent of urban employment in Bangladesh."

উপরন্ত গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর সর্বত্রই এটা চালু রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীর বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে "Migrants are not pulled toward cities by the prospect of jobs and higher income, they are also pushed-out of rural areas by such factors as poverty, natural disaster, lack of work and agricultural land and famine."

সর্বোপরি উন্নয়নশীল বিশ্বে শহরের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন করে থাকে। এদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লোকই নিম্ন পেশায় নিয়োজিত। "All these push and pull factors are not only responsible for creating slums in the city, but also mounting air pollution generating urban wastes, congesting city street, increasing water and sanitation problems."

(খ) বস্তির বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর উন্নয়শীল দেশ সমূহের প্রতিটি শহরে অনাগত এই বিপুল সংখ্যক জনগণকে বাধ্য হয়ে বস্তি ও বাস্তুহারা পরিবেশে বসবাস করতে হয়। তবু তারা শহরেই থাকে, কারণ শহর অন্তত জীবন ধারণের সুযোগ দেয়, যে কোন কাজের সুযোগ দেয় এবং সামান্য হলেও আয়ের সুযোগ দেয়। এই কাজ যত কষ্টেরই হোক এবং আয় যত সামান্যই হোক, তা তাদের পূর্বেকার ঠিকানা গ্রামের চেয়ে ভাল, এটাই শহরের বাস্তবতা। এছাড়া শহর একজন নবাগতকে ক্রমশ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতির পথ করে দেয়। কারো জন্য এই উন্নয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী, কারো জন্য স্বল্প মেয়াদী, কারো কারো জন্য অবশ্য এই উন্নয়ন তেমন বাস্তব চিত্র হয়ে ওঠে না।

ব্যক্তিগত উন্নয়ন ছাড়াও বস্তিবাসী তৃতীয় বিশ্বের যে কোন মহানগরের অর্থনৈতিক কাঠামোর শক্তিশালী অংশ। তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। বস্তিবাসী তথা শহরের দরিদ্ররা অধিকাংশই স্ব-নিয়োজিত এবং শহরের ''ইনফরম্যাল সেক্টরে' কর্মরত।

তৃতীয় বিশ্বের শহরে বস্তি ও বাস্তহারা কলোনী গড়ে উঠে প্রায় যে কোন এলাকাতেই। তবে আমাদের দেশে শহরের যে সব জায়গায় কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, প্রান্তিক ও নীচুমানের জমি যেখানে ভাড়া কম, যেখানে অব্যবহৃত সরকারী জমি পড়ে থাকে, সে সব এলাকাতেই বস্তি গড়ে উঠে। ঢাকা শহরেও এই চিত্র দেখা যায়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর ভাড়াটে ঘরের বস্তি গড়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে সরকারী/আধাসরকারী এমনকি কোন কোন শহরে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির উপর অবৈধ/অননুমোদিত বাস্তহারা কলোনী (বা স্কোয়াটার্স সেটেলমেন্ট) গড়ে উঠে থাকে। শহরে বস্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রধানত বৈধ এবং অবৈধ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শহরে গড়ে উঠা বস্তি অধিকাংশই অবৈধ। কারণ যে বাস্তহারা লোকটি জীবিকার উদ্দেশ্যে শহরে আসে তখন বৈধ বস্তিতে বসবাস করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা প্রদান করার মত আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তাকে আশ্রয় নিতে হয় সরকারী, আধা-সরকারী পরিত্যক্ত স্থানে।

বস্তি বৈধ হোক বা অবৈধ বাস্তহারা হোক, প্রধানত এসব এলকায় ভৌত পরিবেশের অতি নিম্নমান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নানা রকম অসামাজিক কার্যকলাপের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসেবে শহরের বস্তি/বাস্তহারা এলাকাগুলোকে প্রায় সব দেশেরই সরকারকে চিন্তিত করেছে ও বস্তি সমস্যা নিরসন সম্পর্কে নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণে কম বেশী উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে বিগত তিন দশকে বস্তি সমস্যা নিরসন নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ অনেকটা জোরদার হয়েছে। এতে জাতিসংঘের মানব বসতি সংক্রান্ত সংস্থা 'হ্যাবিটাট' ও ইউ এন, এস্কাপ বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ প্রবন্ধে বস্তি বলতে এমন এলাকা বুঝানো হয়েছে যেখানে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি একরে ৩০০ জনের অধিক এবং প্রতি কামরায় বসবাসকারীদের ঘনত্ব ৩ এর অধিক। যেখানে গৃহ নির্মাণের উপকরণের মান খুবই নীচু প্রধানত ঝুপড়ি ও কাঁচাঘর। পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্তা নেই। নেই কোন পাকা রাস্তা, নেই বিদ্যুৎ বা জ্বালানী সরবরাহের ব্যবস্থা। যেখানে মূলত ছিন্নমূল দরিদ্র লোকের বাস।'
" The term Urban squatting means illegal or legal occupation of urban land. Such occupation may be structural or non-structural and occupants of such lands are known as Squatters or Slums. These settlements are also known as various other names in different countries mainly based on local terms. In Bangladesh, India and

Pakistan as Bustees, Jhupris and Jhuggis. In Mexico it is known as jacoles, in Panama as Ranchos, in Brazil as Mooambas, in Sao Paulo and Reo-de Janeroe as Farvelos and in Peru as Barridas.[১]

৩.০ বাংলাদেশের নগরায়নে বস্তি সৃষ্টির প্রবণতা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প নগরায়িত জনসংখ্যার দেশ, কিন্তু সাম্প্রতিককালে এখানে নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি উচ্চ বৃদ্ধি হার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (সারণি-১)। তাছাড়া, দেশের মোট জনসংখ্যার বিপুলতার কারণে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ন হার সত্ত্বেও দেশের মোট নগরায়িত জনসংখ্যার পরিমাণ আদৌ কম নয়। বর্তমানে (১৯৯৭) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা অনুমান করা হয় প্রায় ১২৪ মিলিয়ন। নগরায়িত জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ, অর্থাৎ মোট নগর জনসংখ্যা প্রায় ২৪ মিলিয়ন। বিগত দুই দশকে নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক গড় প্রায় ৭ শতাংশ। অন্যদিকে এই সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৩ এরও কম। নগরায়নের এই বৃদ্ধির হার সম্প্রতিকালে পৃথিবীর অন্য কোন বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে পরিলক্ষিত হয় নাই।[২] জনমিতিকগণ আশা করছেন, বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কিছুটা হ্রাস পাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০০০ সালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে ৪.৮%, ২০১০ সাল নাগাদ ৪.০% এবং ২০১৫ সাল নাগাদ ৩.০%। এভাবে কমতে থাকলেও উল্লিখিত সালগুলিতে বাংলাদেশে নগরায়নের মাত্রা ও জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হবে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬.০% হবে নগরবাসী, অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যদি তখন ১৪১ মিলিয়নও হয়, তাহলে নগর জনসংখ্যা হবে ৩৭ মিলিয়ন, ২০১০ সালে এই নগরায়ন হার হবে ৩৩.% এবং মোট নগর জনসংখ্যা হবে ৫৭ মিলিয়ন, ২০২৫ সালে নগরায়ন হার হবে ৪৫% এবং নগর জনসংখ্যা প্রায় ৮০ মিলিয়ন।[৩]

সারণি-১ ঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নগরায়নের ধারা

দেশের নাম	১৯৯১ সালে মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	নগরায়নের হার	নগর জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার
বাংলাদেশ	১১১	২০	৬.০০
ভারত	৯৭৭	৩১	৫.১
পাকিস্তান	১১০	৩৪	৫.৫
শ্রীলংকা	২১	২৩	৪.৯
ফিলিপাইন	৬৮	৫১	৪.২
ইন্দোনেশিয়া	২০৬	৩৩	৫.৬
থাইল্যান্ড	৬৪	২৭	৫.১

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯১।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নগরায়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগের স্বল্পতা, দরিদ্রতার প্রবণতা বৃদ্ধি, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যুবকের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন নদী ভাঙ্গণ, উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং খরা ইত্যাদি। এই সকল বেকার লোকজন অধিকাংশই দেশের বড় বড় শহরে কর্ম-অন্বেষণে ছুটে আসছে। এ কারণে দেখা যায় যে, বর্তমানে একমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরেই বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যার ৪৩ ভাগ মানুষ বসবাস করছে। এদের মধ্যে রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ঢাকার তুলনামূলক আয়তন আরো বিসদৃশ। ১৯৮৯ সালে মোট নগর জনসংখ্যার (২২ মিলিয়নের) প্রায় ৩২ ভাগই হচ্ছে একমাত্র ঢাকা শহরের অধিবাসী। বিগত দুই দশকে ঢাকা মহানগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যন্ত দ্রুতহারে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮%-১০% হারে। ১৯৭৪ সালে এই মহানগরীরর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১,৬০০,০০০, ১৯৮১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪০০,০০০ এবং একই সীমানাভুক্ত শহর এলাকার জন্য এই সংখ্যা বর্তমানে (১৯৯৭) সম্ভবত ৯ মিলিয়ন। ২০০০ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা হবে ১০ মিলিয়নের উপর, ২০১০ সালে ১৫ মিলিয়ন এবং ২০২৫ সালে প্রায় ২০ মিলিয়ন।[৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আরবান ষ্টাডিজ এর একটি সীমক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরে সম্প্রতিকালে যে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছ তার অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে। অর্থাৎ ঢাকা মহানগর এখন প্রধানত বহিরাগতদের শহর। এখানকার প্রায় ৬০ ভাগ মানুষেরই জন্ম এই শহরের বাইরে। ঢাকার সাম্প্রতিক গ্রাম-শহর স্থানান্তরকারীর বেশীর ভাগই দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। এরা প্রধানত রাজধানীতে এসেছে অর্থনৈতিক কারণে, জীবিকা অন্বেষার তাগিদে। গ্রামাঞ্চলের দুঃসহ দারিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রতিকূল সম্ভাবনা তাদেরকে ঢাকামুখী করেছে। এ জাতীয় প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় কম বেশী বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল দেশেই।[৫]

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার ঢাকায় প্রবেশের ফলে শহরের গৃহসংস্থান পরিস্থিতির উপর মারাত্মক চাপ পড়ে। কোন অবস্থাতেই সরকারী বা বেসরকারীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বা গ্রহণযোগ্য মানের গৃহসংস্থান সম্ভব হয় না। গৃহ নির্মাণ ও সরবরাহ, চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় মারাত্মকভাবে পিছিয়ে থাকে। বিশেষ করে সরকারী উদ্যোগে গৃহায়ন যে কতটা অকিঞ্চিৎকর, তা প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর একটি সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন "ঢাকায় কর্মরত ১লক্ষ ১৫ হাজার সরকারী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১২ হাজার সরকারী কর্মচারী কলোনী বা বাসা পাইয়াছে। এই ১২

হাজারের মধ্যে ৭০ ভাগই কর্মকর্তা পর্যায়ের। নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বাসার ব্যবস্থা খুবই নগণ্য। তবে ওয়াপদা, ওয়াসা, পি. ডব্লিউ. ডি, সড়ক জনপথ, রেলওয়ে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আবাসিক সুবিধা রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগের বেশী নহে।" বেসরকারী খাতে বা প্রাইভেট সেক্টরেও গ্রহণযোগ্য মান সম্পন্ন গৃহ-নির্মাণ খুবই অপর্যাপ্ত। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সাধারণ নাগরিকরাও আবাসন সমস্যার শিকার। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের আবাসন সমস্যা আরো জটিল এবং গৃহায়নের এই পরিস্থিতির একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা ফল হচ্ছে শহরে দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠা অসংখ্য বস্তি (স্লাম) ও বাস্তুহারা এলাকা (স্কোয়াটার্স)।[৬]

এই পরিস্থিতি শুধু ঢাকা বা বাংলাদেশের একক বৈশিষ্ট্য নয় বরং আধুনিক নগরায়নের এটা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য ধারা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এমনকি অধুনা দ্রুতহারে উন্নতিশীল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহেও প্রায় একই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এসব দেশের রাজধানী তথা বৃহত্তম শহরগুলিতে তাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০-২৬ শতাংশ জনগণ বস্তি ও বাস্তুহারা এলাকার অধিবাসী। এর মধ্যে বাস্তুহারা এলাকায় থাকে ৫.০%। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা মহানগরীর বর্তমান (১৯৯৭) মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়ন, বস্তিবাসী ও বাস্তুহারা জনসংখ্যা প্রায় ৪ মিলিয়ন এবং অবৈধ বস্তির জনসংখ্যা বা বাস্তুহারাদের (স্কোয়াটার্স) সংখ্যা প্রায় ০.৩ মিলিয়ন।[৭]

৪.০ বস্তি সমস্যা নিরসনে প্রচেষ্টা

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক বড় শহরেই বস্তি ও বাস্তুহারাদের সমস্যা প্রকট। এ সম্পর্কে পঞ্চাশ দশকের পূর্বে তেমন কোন চিন্তা-ভাবনা না করা হলেও সম্প্রতি অধিকাংশ দেশের জাতীয় সরকার এবং শহর-প্রশাসন এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। সমস্যাটি এড়িয়ে না গিয়ে অনেকেই এর মোকাবেলা করতে উদ্যোগী হন। প্রধানত ১৯৫০-এর পর থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বড় শহরগুলোর বস্তি সমস্যা নিরসনের সুনির্দিষ্ট সরকারী প্রচেষ্টা গ্রহণ শুরু হয়। তখন থেকে বস্তি সমস্যা নিরসনে বা বস্তি উন্নয়নের জন্য যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে ৩টি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) বস্তি উচ্ছেদ (স্লাম ক্লিয়ারেন্স) Slum Clearance

(খ) বস্তি স্থানান্তর (স্লাম রিলোকেশন) Slum Relocation

(গ) বস্তি উন্নয়ন (স্লাম আপগ্রেডিং) Slum Upgrading

বস্তি উচ্ছেদ (স্লাম ক্লিয়ারেন্স)

এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে মনে করা হয় যে, বস্তি ও বস্তিবাসী মানেই শহরবাসীদের মন্দ কিছু, বস্তি দৃষ্টিকটু এবং গণ-স্বাস্থ্যের প্রতি বিরাট হুমকি। সুতরাং যেভাবেই হোক বস্তি, বিশেষ করে অবৈধ বস্তি বা স্কোয়াটার্সকে বাস্তবিক অর্থে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনে একাধারে যেমন বুলডোজার ব্যবহার করা যাবে, অগ্নি সংযোগ করা যাবে, অপর দিকে এই বস্তিবাসীদের মারধর, ধরপাকড় করে সমূলে উৎপাটন করা যাবে। এই শ্রেণীতে পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছাড়াই বস্তিসমূহ উচ্ছেদ করা হয়ে থাকে।

বস্তি উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার ফলে বস্তিবাসীদেরকে তাদের বর্তমান ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়, এমনকি বস্তির ভেতরকার অসংখ্য উৎপাদনশীল কারখানা ও ব্যবসায়িক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সমূহকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়া কখনও এমনভাবে করা হয়ে থাকে এতে বস্তি পরিবারসমূহের সামান্য, কিন্তু তাদের কাছে মূল্যবান সম্পদও ধ্বংস করা হয়। এ ধরনের বস্তি উচ্ছেদ পদ্ধতির প্রয়োগের অন্যতম উদাহরণ ১৯৬৭ সালে কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহরে ১,৩৬,৫০০ অবৈধ বস্তি গৃহের উচ্ছেদ অভিযান। তবে এতে সমস্যার খুব একটা স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়নি, কারণ বস্তিবাসীরা ঘুরেফিরে আবার শহরের অন্য জায়গায় ঠাই করে নিয়েছে ঠিকই। সম্প্রতি ভারতের বোম্বে শহরে এ ধরনের বস্তি উচ্ছেদ কার্যক্রম বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। আজকাল অন্য কোথাও সাধারণত এই প্রাচীন পন্থার বস্তি উচ্ছেদ পদ্ধতির মাধ্যমে বস্তি সমস্যার নিরসনের চেষ্টা করা হয় না। তাছাড়া এরকম অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মানব-বসত সংক্রান্ত সংস্থা "হ্যাবিটাট" এবং ইউ এন এস্‌কাপ-এর সুস্পষ্ট পরামর্শ রয়েছে।[৮]

এই পদ্ধতিতে শহরের কেন্দ্রীয় এলাকার বস্তিবাসীদেরকে তাদের পুরাতন বস্তি থেকে শহরের বাইরে দূরবর্তী নতুন এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় স্থানান্তরিত বস্তিবাসীরা আবার শহরের কেন্দ্র স্থলেই ফিরে আসে। ফলে স্থানান্তর পদ্ধতি অকেজো হয়ে পড়ে। ১৯৫০ এর দশকে ফিলিপাইন সরকার রাজধানী ম্যানিলায় ব্যাপকহারে প্রথম এই প্রক্রিয়ায় বস্তি স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম উদাহরণ ১৯৬০-৭০ সালের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক মাদ্রাজেও প্রায় ৫৮,০০০ বস্তিবাসীকে স্থানান্তর করে শহরের বাইরে নেয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৭২ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ২৮,০০০ বাস্তুহারাকে সরিয়ে নিয়ে অতি স্বল্প মূল্যের ঘর-বাড়ি দেয়া হয়, কিন্তু কার্যক্রম বিশেষ সফল হয়নি। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককেও বস্তি স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কিন্তু ফলাফল আশাপ্রদ হয়নি। সম্প্রতি ব্যাংককে এ ধরনের স্থানান্তর পদ্ধতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণ-বিরোধিতা লক্ষ্য করা গেছে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ ছাড়া বস্তি পুনর্বাসন প্রায় অসম্ভব, সুপরিকল্পিত হলে এতেও বস্তিবাসীদের মঙ্গল হতে পারে।

বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকা শহরেও বস্তি উচ্ছেদ ও স্থানান্তর পদ্ধতি বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন সরকার জরুরী আইনের আওতায় ঢাকা শহর থেকে প্রায় ২,০০,০০০ বস্তিবাসী/বাস্তুহারাকে উচ্ছেদ করে এবং এদের মধ্যে মাত্র ৭০,০০০কে ঢাকার শহরতলী এলাকায়, যেমন ডেমরার চনপাড়ায়, টংগীর দত্তপাড়ায় এবং মীরপুরের ভাসানটেকে স্থানান্তর করে। প্রথম দিকে পদ্ধতিগত কারণে কার্যক্রম সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। স্থানান্তরিত অনেকেই আবার ঢাকায় ফিরে আসে। তবে পরবর্তীকালে কাছাকাছি এলাকায় এবং পুনর্বাসন এলাকার ভেতরেও নতুনভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় পুরাতন বাসিন্দা এবং নতুন কেউ কেউ এইসব পুনর্বাসন এলাকায় বসবাস করতে সম্মত হয়। টংগীস্থ দত্তপাড়ায় এবং মীরপুরে নতুন করে উন্নত ধরনের পুনর্বাসন কার্যক্রমের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।[৯]

বস্তি উন্নয়ন (স্লাম আপগ্রেডিং)

বস্তি সমস্যা নিরসনকল্পে সাম্প্রতিক পদ্ধতি হিসেবে এখন বস্তির স্থানীয় ভিত্তিক উন্নয়ন বা 'আপগ্রেডিং' কেই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্লাম আপগ্রেডিং সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বস্তি ও বৈধ বস্তিতে সম্পাদিত হলেও অনেক শহরে অবৈধভাবে গড়ে উঠা বস্তিতে বা স্কোয়াটার্স এলাকাতেও স্লাম আপগ্রেডিং ও 'রেগুলাইজেশন' কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বস্তির অভ্যন্তরীণ ভৌত পরিবেশ ও সুবিধাদির উন্নয়ন করা হয়। যেমন রাস্তা, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ইত্যাদিসহ বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন কার্যক্রমে বস্তিবাসীদের নিজস্ব অংশগ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। এই ধরনের কার্যক্রমের ফলে সাধারণত বস্তির স্থাবর সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি করা হয় না, এবং এই ব্যয় সাধারণত আন্তর্জাতিক সাহায্য হিসেবে বা সরকারী অনুদান হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়। গৃহ নির্মাণ সাধারণত পরিবারের নিজস্ব উদ্যোগে হয়ে থাকে। আপগ্রেডিং যেহেতু কাউকে স্থানান্তর করায় না, সুতরাং সকলেই তাদের পুরাতন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারে,তাদের সামাজিক সংযোগও অপরিবর্তিত রাখতে পারে। এমনকি বস্তি উন্নয়নের খরচ অনেকটাই বস্তিবাসীরা নিজেরাই বহন করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও জাম্বিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে'৭০ দশকে কলকাতা শহরে। এতে প্রায় ১৯ লক্ষ বস্তিবাসী উপকৃত হয়েছে। প্রায় ৫০০ কোটি রুপি ব্যয় করে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার কাম্পুং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম, জাম্বিয়ার লুসাকা বস্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম, করাচীর বলদিয়া বস্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম, ম্যানিলার টন্ডো ফোরশোর উন্নয়ন প্রোগ্রাম, শ্রীলংকার সাম্প্রতিক মিলিয়ন হাউস প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত শহর এলাকার বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী, বস্তি উন্নয়নে আপগ্রেডিং পদ্ধতির উজ্জ্বল উদাহরণ। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে গৃহীত "কাচ্চি আবাদী রেগুলারাইজেশন" কার্যক্রম আরেকটি ব্যাপক ও বৃহদাকার উল্লেখযোগ্য বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম।[১০] বাংলাদেশে ঢাকা শহরের লালবাগ এলাকাতেও ঢাকা পৌর কর্পোরেশন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গ্রাম ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে দেশের পাঁচটি শহরে- দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি ও সিলেট-স্থানীয় পৌরসভার মাধ্যমে ১৯৮৫ সন থেকে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় আরও ২০টি শহরে বস্তি উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।[১১]

৫.০ মহানগরীর বস্তি সমস্যা এবং এর প্রকৃতি

মহানগরীর বর্তমান বস্তি ও বস্তিবাসীদের সংখ্যাধিক্য নগর জীবনে এক প্রকট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই শহরে বস্তির অস্তিত্ব কয়েক শতাব্দীকালের প্রাচীন হলেও সাম্প্রতিককালে সমস্যাটি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশে, বিশেষ করে গ্রামে, দরিদ্র লোকের সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তিবাসীদের তথা শহরে দরিদ্রদের সংখ্যা অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলেছে। এ জন্য আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অন্যান্য নানা কারণই হয়তো দায়ী, তবু বলা বাহুল্য যে বস্তির অসন্তোষজনক ভৌত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশ, বস্তিবাসীদের জন্য এবং ব্যাপকভাবে বস্তি বহির্ভূত শহরবাসী অন্যান্য নাগরিকদের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এই অবস্থার নেতিবাচক প্রভাব একাধারে বাংলাদেশ সরকারকে যেমন চিন্তিত করে তুলেছে, অপরদিকে গোটা শহরবাসীকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে চলতে হচ্ছে।

প্রবন্ধের এই অংশে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকাসহ প্রধান চারটি মহানগরীর বস্তি সমস্যা ও প্রকৃতি আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তবে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যান্য শহরের উপর তেমন নিবিড় গবেষণা না হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট উপাত্তের স্বল্পতার জন্য আলোচ্য বক্তব্যে ঢাকা মহানগরীর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

তবে মহানগরীর বস্তির ভৌত পরিবেশ এবং বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর পর্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি থাকলেও বস্তির

সংখ্যা ও বস্তিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন। এক এক সংস্থার দ্বারা পরিচালিত জরিপের তথ্য এক এক রকম। এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, অধিকাংশ জরিপই অল্প সময়ের মধ্যে কিছুটা তাড়াহুড়ার মধ্যে সম্পাদন করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সংস্থা পরিচালিত জরীপ বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হয়েছে। ফলে বস্তি কিংবা বস্তিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতা আসতে পারে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন সংস্থার জরিপের এলাকার মধ্যেও অভিন্নতা ছিল না। নগর গবেষণা কেন্দ্রের ১৯৭৮, ১৯৮০ ও ১৯৮৮ সালের সকল জরিপ ছিল ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকার জন্য, অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮৭ সালের জরিপ পরিচালনা করেছে ঢাকা স্ট্যাটিষ্টিক্যাল মেট্রোপলিটান এরিয়ার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং এইভাবে গৃহীত জরিপের তথ্য ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। চতুর্থত, বস্তির সংখ্যা এবং বস্তিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করবে জরিপ সংস্থা পরিচালনাকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর।[১১] নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোচ্য বিষয়ের চিত্র তুলে ধলা হলো ঃ

ক) বস্তিতে জনবসতির ঘনত্ব

শহরে এসেই প্রথমে ছিন্নমূল মানুষটি চায় সামান্য একটু মাথা গোজার স্থান। বেকার সহায় সম্বলহীন মানুষটি তখন খোঁজে সবচেয়ে সহজলভ্য সস্তা ক্ষুদ্র একটু জায়গা। সে জায়গা যেখানেই হোক। সস্তায় অতি স্বল্প পরিসরের নীচু মানের একটু জায়গাই তখন ঐ মানুষটির সবচেয়ে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় স্থান। যেহেতু এ ধরনের মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছে সেহেতু অতি অল্প পরিসর জায়গা নিয়ে বসবাস করে বলেই বস্তি এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব অতি উচ্চ হয়ে থাকে। সাধারণত শহরের আবাসিক এলাকায় একর প্রতি জনবসতির ঘনত্ব চিন্তা করা হয় ৫০-২০০ জন। টংগীর দত্তপাড়া বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকাতেও এই ঘনত্ব ৩০০ জনের কম। অথচ ঢাকা শহরের অধিকাংশ বস্তি ও বাস্তহারা এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব একর প্রতি ১০০০-২০০০, এমনকি ২৫০০ পর্যন্ত। এরকম অস্বাভাবিক উচ্চ ঘনত্ব রীতিমত অবিশ্বাস্যই মনে হতে পারে। নিম্নে তুলনামূলক জরিপের ফলাফল থেকে বিষয়টি উপলব্ধি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার ব্যাপকতার গুরুত্ব চিহ্নিত হয়েছে।

নগর গবেষণা কেন্দ্র ১৯৮৮ সালের জরিপের সময় প্রতিটি বস্তি এলাকার স্কেচ মানচিত্র ও আনুমানিক আয়তন পরিমাপ করেছে। এতে দেখা যায় ১১২৫টি বস্তির আওতায় মোট ১৩৪০ একর জমি রয়েছে অর্থাৎ একর প্রতি জনবসতির গড় ঘনত্ব হচ্ছে ৬৫৫ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ৪১৯২০০ জন, যেখানে ঢাকার পৌর

কর্পোরেশনের এলাকাধীন শহর এলাকার গড় ঘনত্ব হচ্ছে মাত্র ৫৫,০০০ জন। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের ১৯৯৬ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ঢাকা মহানগরীর ঘনত্ব একর প্রতি ২০ (বিশ) গুণেরও বেশী। এরকম অস্বাভাবিক উচ্চ ঘনত্ব দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো সিটি, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা এবং পাকিস্তানের করাচি মহানগরী সমূহেও নেই।[১১] মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্প বস্তির মোট আয়তন মাত্র ৪৩,০০০ বর্গফুট। এই এলাকায় ১৯৯৬ সনের এক জরিপে ২৯,০০০ এর অধিক লোক বাস করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) বস্তির ভৌত পরিবেশ

বেশীর ভাগ বস্তির ভৌত পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের। এদের মধ্যে অবৈধ বস্তি বা বাস্তহারা এলাকাগুলোর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। এসব এলাকার ভেতর সাধারণত পায়ে চলারও কোন নির্ধারিত রাস্তা থাকে না। আর থাকলেও তা অত্যন্ত অপ্রশস্থ। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কোন কোন বস্তিতে ২০-৪০টি পরিবারের জন্য থাকে একটি মাত্র পায়খানা। কোন কোন অবৈধ বস্তিতে হয়তো একটিও পায়খানা নেই। বস্তির ভেতর কোন পানির কল নেই এমন বস্তিও আছে। অধিকাংশ বস্তিতেই বিদ্যুৎ নেই, গ্যাস নেই, পরিসংখ্যান ব্যুরোর'৮৭ সালের জরিপ অনুযায়ী ঢাকার বস্তিবাসীদের মাত্র ৪২ ভাগ বিদ্যুৎ আলো ব্যবহার করে।[১২] অর্থাৎ দেশের রাজধানী শহরে এক বড় সংখ্যার জনগোষ্ঠী এ জাতীয় নিম্নমান ভৌত পরিবেশে জীবন-যাপন করে।

গ) বস্তির ঘর-বাড়ির ভৌত অবকাঠামো

বস্তির ঘর বাড়ি প্রায় সবই কাঁচা এবং নিকৃষ্টমানের। ১৯৮৮ সালের জরিপ অনুযায়ী বস্তির মাত্র ১০ ভাগ ঘর-বাড়ি পাকা কিংবা আধাপাকা (পাকা ৩%, আধাপাকা ৭%)। বাকী সব কাঁচা উপকরণের (বাঁশ/টিনের/বাঁশ অথবা মুলি, ঝুপড়ি)। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৮৭ সালের জরিপে দেখা যায় বস্তিতে পাকা ঘর-বাড়ির পরিমাণ শতকরা ১.৯৮ভাগ।[১৩] অনেক ক্ষেত্রেই দরজার বেড়া ও টিনের চাল কিংবা বাঁশের চালের লম্বা সারি সারি ঘর করে দেয়া হয়। তার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট কামরা বানিয়ে পরিবার ভিত্তিক ভাড়া দেয়া হয়। অবৈধ বস্তির কাঠামো আরো নাজুক। এগুলো মুলি বাশের ছাদ এবং বেড়া। বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পলিথিন দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়। এই জাতীয় বস্তির উচ্চতা সাধারণতঃ ৩-৪ ফুট যেখানে ঢোকার সময় মাথাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় এবং ভিতরে কখনও সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

ঘ) বস্তিবাসীর বাসস্থানের পরিমাণ

বস্তিবাসীরা খুব অল্প জায়গা নিয়ে ছোট ছোট ঘরে বসবাস করে। এক তৃতীয়াংশ বস্তিবাসীই পরিবার প্রতি ৬০ বর্গফুটের বাসস্থান বিশিষ্ট ঘরে বাস করে, অর্থাৎ জনপ্রতি ১০-১৫ বর্গফুট। প্রায় ৫০% বস্তি পরিবার বাস করে ৬১-১২০ বর্গফুট আয়তনের ঘরে। বাকী ১৮-২০% এর চেয়ে বেশী (কিন্তু ৩০০ বর্গফুটের কম) জায়গা নিয়ে বসবাস করে।[১৬]

ঙ) বস্তির সংখ্যা ও বস্তির জনসংখ্যা

নগর গবেষণা কেন্দ্রের ১৯৮৮ এবং ১৯৯৬ সালের জরিপ থেকে দেখা যায়, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকায় মোট ১১২৫টি ছোট বড় বস্তি এলাকা ছিল, এর মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৭৮,০০। এর মধ্যে অবৈধ বস্তির সংখ্যা ছিল ৩৪১টি এবং এগুলোতে লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। বস্তির সর্বনিম্ন সাইজ ধরা হয়েছিল অন্ততঃ ১০টি পরিবার বিশিষ্ট এলাকা। তবে এর চেয়েও ছোট ছোট অনেক বস্তি ছিল। তাতে করে তখন পৌর এলাকার ভেতর মোট বস্তি জনসংখ্যা ছিল ১০০০,০০০। অর্থাৎ পৌর এলাকার মোট জনসংখ্যার ২০%। তবে অনুমান করা যায় বর্তমানে এই অনুপাত আরো বেশী হবে এবং সম্ভবতঃ তা ৩০ ভাগ। অর্থাৎ ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমানে বস্তি জনসংখ্যা হবে প্রায় ১৫ লক্ষ এবং রাজউক অন্তর্ভূক্ত এলাকায় এই সংখ্যা হবে ২০-২৫ লক্ষ [১৭] ১৯৮৭ সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে ঢাকা মহানগরীতে বস্তির সংখ্যা ৪৮৯ এবং এগুলোতে বসবাসকারীদের সংখ্যা ৩,৩৫,৭২৩ জন। এ সংখ্যার সাথে নগর গবেষণা কেন্দ্রের অবৈধ বস্তিবাসীদের সংখ্যার মিল আছে।[১৮] বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে, রাজধানীমূখী জনস্রোত বর্তমান ধারায় অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বৎসরে ঢাকা মহানগরীর বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

চ) শহরে বস্তির অবস্থান

মানচিত্রে ঢাকা মহানগরীর বস্তির বিস্তরণের ধরণ থেকে দেখা যায়, শহরের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু বস্তি রয়েছে। পৌর এলাকার ৭৫টি (১৯৮৮) ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড (মতিঝিল কলোনী এলাকা) ছাড়া প্রত্যেক ওয়ার্ডেই বস্তি দেখা যায়। বিশেষত লালবাগসহ পুরনো ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে, আগারগাঁও, শ্যামলী, কলাবাগান, সোবহানবাগ, মোহাম্মদপুর, রায়েরবাজার, গেন্ডারিয়া, বাসাবো, মাদারটেক, খিলগাঁও, রামপুরা, মালিবাগ, তেজগাঁও, নাখালপাড়া, মহাখালী, বাড্ডা, মণিপুর, শেওড়াপাড়া, মীরপুর এমনকি বনানী গুলশানেও বস্তি আছে। রেল লাইনের দীর্ঘ এলাকা জুড়েই বস্তি। সাধারণভাবে বলা যায়, শহরের পুরাতন কেন্দ্রীয় এলাকা,

মধ্যবর্তী এলাকা, শহর সীমান্ত এলাকা এবং শহরতলী সর্বত্রই বস্তি রয়েছে। তবে যে সব জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে তার কাছাকাছি জায়গাতেই বস্তি গড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরের বস্তির অবস্থানের বৈশিষ্ট্যে উপর প্রখ্যাত ভূগোলবিদ প্রফেসর নজরুল ইসলাম ও তার সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, এই সব শহরে মিল, কলকারখানা ও সহজে কর্মসংস্থানের কাছাকাছি বস্তি গড়ে উঠেছে। এছাড়া রেল লাইন পরিত্যক্ত সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জমির উপরে অবৈধ বস্তি গড়ে উঠেছে। এই ধারা ঢাকা ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য মহানগরীতে বস্তি গড়ে উঠা ধারার সাথে সংগতি সম্পন্ন।[১৯] যদিও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলের খুব কাছে বস্তি গড়ে উঠলে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা সংগঠিত হতে পারে। যেমনটি ১৯৮৪ সনে ভারতের ভূপাল শহরে ইউনিয়ন কারবাইড ফ্যাক্টরীতে ঘটেছিল, এতে ২,৯৮৮ জন বস্তিবাসী মারা যায় এবং কমপক্ষে ১,০০,০০০ লোক আহত হয়।

ছ) বস্তি মালিকানার প্রকার

বৈধতা ও জমির মালিকানা অনুযায়ী বস্তির ধরন বা প্রকার চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের পৌর এলাকার বস্তি জরীপে মোট বস্তির ৩৫% লোকসংখ্যা ছিল অবৈধ বস্তি বা সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জমিতে গড়ে উঠা বস্তি এবং বাকী ৬৫% বস্তিবাসী বাস করতো বৈধভাবে গড়ে উঠা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর। অবৈধ বস্তির সংখ্যা চিল ৩৪৯টি। এগুলোকে বাস্তহারা এলাকা বলা যায়।[২০] ১৯৯৬ সালে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে অবৈধ বস্তির হার ৪৫% এর বেশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১] নিম্নে ঢাকা মহানগরীরর বস্তির মালিকানার ভিত্তিতে এর প্রকার ভেদ আলোচনা করা হলোঃ

অবৈধ বস্তিঃ রেল লাইনের ধারে, রিংরোড, সোনারগাঁও রোডের মত বড় রাস্তার পাশে, আগারগাঁও এলাকার সরকারী জমিতে, পৌর কর্পোরেশন, রাজউক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী মালিকানার অব্যবহৃত জমিতে ঘর তুলে অবৈধ বস্তিবাসীরা বসবাস করে। এরা সাধারণত ঘরে আড্ডা দেয় না, তবে অনেকেই কাউকে না কাউকে অবস্থান ফি বা জমির ভাড়া দেয়। অবৈধ বস্তি বিভিন্ন ধরনের অভিজাত সরকারী পাড়ার আনাচে কানাচেও ছোট ছোট বস্তি শ্রেণীর অবৈধ ঘর-বাড়ি গড়ে উঠেছে।

বৈধ প্রাইভেট বস্তি ঃ প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠা বস্তি। এগুলোতে নিকৃষ্টমানের আবাসিক সুবিধা দিয়ে ঘর তৈরি করে অতি উচ্চ ঘনত্বে মেস এবং পারিবারিক বস্তি বানিয়ে ভাড়া দেয়া হয়। এসব জায়গায় ভৌত সুবিধাদি

মধ্যবর্তী এলাকা, শহর সীমান্ত এলাকা এবং শহরতলী সর্বত্রই বস্তি রয়েছে। তবে যে সব জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে তার কাছাকাছি জায়গাতেই বস্তি গড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরের বস্তির অবস্থানের বৈশিষ্ট্যে উপর প্রখ্যাত ভূগোলবিদ প্রফেসর নজরুল ইসলাম ও তার সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, এই সব শহরে মিল, কলকারখানা ও সহজে কর্মসংস্থানের কাছাকাছি বস্তি গড়ে উঠেছে। এছাড়া রেল লাইন পরিত্যক্ত সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জমির উপরে অবৈধ বস্তি গড়ে উঠেছে। এই ধারা ঢাকা ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য মহানগরীতে বস্তি গড়ে উঠা ধারার সাথে সংগতি সম্পন্ন।[১৯] যদিও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলের খুব কাছে বস্তি গড়ে উঠলে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা সংগঠিত হতে পারে। যেমনটি ১৯৮৪ সনে ভারতের ভূপাল শহরে ইউনিয়ন কারবাইড ফ্যাক্টরীতে ঘটেছিল, এতে ২,৯৮৮ জন বস্তিবাসী মারা যায় এবং কমপক্ষে ১,০০,০০০ লোক আহত হয়।

ছ) বস্তি মালিকানার প্রকার

বৈধতা ও জমির মালিকানা অনুযায়ী বস্তির ধরন বা প্রকার চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের পৌর এলাকার বস্তি জরীপে মোট বস্তির ৩৫% লোকসংখ্যা ছিল অবৈধ বস্তি বা সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জমিতে গড়ে উঠা বস্তি এবং বাকী ৬৫% বস্তিবাসী বাস করতো বৈধভাবে গড়ে উঠা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর। অবৈধ বস্তির সংখ্যা চিল ৩৪৯টি। এগুলোকে বাস্তহারা এলাকা বলা যায়।[২০] ১৯৯৬ সালে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে অবৈধ বস্তির হার ৪৫% এর বেশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১] নিম্নে ঢাকা মহানগরীরর বস্তির মালিকানার ভিত্তিতে এর প্রকার ভেদ আলোচনা করা হলোঃ

অবৈধ বস্তিঃ রেল লাইনের ধারে, রিংরোড, সোনারগাঁও রোডের মত বড় রাস্তার পাশে, আগারগাঁও এলাকার সরকারী জমিতে, পৌর কর্পোরেশন, রাজউক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী মালিকানার অব্যবহৃত জমিতে ঘর তুলে অবৈধ বস্তিবাসীরা বসবাস করে। এরা সাধারণত ঘরে আড্ডা দেয় না, তবে অনেকেই কাউকে না কাউকে অবস্থান ফি বা জমির ভাড়া দেয়। অবৈধ বস্তি বিভিন্ন ধরনের অভিজাত সরকারী পাড়ার আনাচে কানাচেও ছোট ছোট বস্তি শ্রেণীর অবৈধ ঘর-বাড়ি গড়ে উঠেছে।

বৈধ প্রাইভেট বস্তি ঃ প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠা বস্তি। এগুলোতে নিকৃষ্টমানের আবাসিক সুবিধা দিয়ে ঘর তৈরি করে অতি উচ্চ ঘনত্বে মেস এবং পারিবারিক বস্তি বানিয়ে ভাড়া দেয়া হয়। এসব জায়গায় ভৌত সুবিধাদি

খুবই অপ্রতুল কিন্তু প্রতি বর্গফুট জায়গায় ভাড়া অতি উচ্চ। নগর গবেষণা কেন্দ্রের'৮৮ সালের জরিপ অনুযায়ী মহানগরীর বস্তির জমির মালিকানা প্রধানত ব্যক্তিগত (৬৫%), তবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ (২৯%) জমির মালিক সরকার কিংবা বিভিন্ন আধাসরকারী, স্বায়তশাসিত সংস্থা, অন্যান্য ধরনের মালিকানা বা মালিকানা স্বত্ব সুনিশ্চিত নয় এমন বস্তি বাকী ৬ ভাগ।[২২] উপর্যুক্ত একই জরিপে চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী শহরের মালিকানার ধরন বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ ঢাকা মহানগরীর চেয়ে এই সকল শহরে অবৈধ বস্তির হার ৭৫ ভাগের উর্ধ্বে।

জ) বস্তিবাসীদের ঘর ভাড়ার ধরন

অবৈধ বস্তিতে, অর্থাৎ বাস্তহারা এলাকাগুলোতে, সাধারণত ঘর ভাড়া দেয়া লাগে না। তবে জমিতে ঘর তোলার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এক ধরনের 'মাস্তান ফি' অথবা জমির ভাড়া দিতে হয়। ঢাকা জেলা প্রশাসকের দফতরে সাম্প্রতিক, ৮৯ জরিপ অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ বস্তিবাসী মাস্তানদের ভাড়া প্রদান করে।[২৩] তবে সামগ্রিকভাবে শহরের প্রায় এক পঞ্চমাংশ বস্তিবাসী ঘরের কোন ভাড়া দেয় না অর্থাৎ এরাই বাস্তহারা এবং নিজের ঘর (বা ঝুপড়ি) নিজে করে নিয়েছে। বাকী সবাই ঘর ভাড়া করে থাকে এবং প্রায় ৫০ ভাগ বস্তিবাসী প্রতিমাসে ঘর বা কামরা ভাড়া হিসেবে ২০০ টকার বেশী দেয় এবং ২০% বস্তি পরিবার ৩০০ টাকার উপর ভাড়া দেয়, সর্বোচ্চ একটি বস্তি কামরার ভাড়া ৫০০-৬০০ টাকাও হতে পারে। দরিদ্র বস্তিবাসীরা কাঁচা ঘরের জন্যেও প্রতি বর্গফুটে গড়ে ৪ টাকার মত ভাড়া দেয় এবং অন্তত ৮ শতাংশ বস্তিবাসী প্রতি বর্গফুটে ৫ টাকার উপর ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এলাকার প্রথম শ্রেণীর সকল সুযোগ সুবিধাসহ পাকা বাড়ির ভাড়া হয় সাধারণত প্রতি বর্গফুটে ৩-৪ টাকা মাত্র। কমপক্ষে ১৫.০% বস্তির পরিবার তাদের মোট মাসিক আয়ের ২০ ভাগেরও বেশী খরচ করে ঘর ভাড়া হিসেবে। প্রায় ৩৪.০% বস্তি পরিবার আয়ের ১০-২০ শতাংশ খরচ করে ঘর ভাড়া হিসেবে।[২৪]

ঝ) বস্তিবাসীদের কর্মস্থলের দূরত্ব ও যাতায়াতের ব্যবস্থা

ঢাকার বস্তিবাসীরা কাজের জায়গার কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় সংস্থান করে নেয়। প্রায় ৭৫ ভাগ বস্তিবাসীই কাজের জায়গা থেকে ১ মাইলের মধ্যে বসবাস করে। আরো ১৫ ভাগ ২ মাইলের মধ্যে, বাকীরা এর বেশী দূরত্বে। কাছাকাছি থাকার কারণে পায়ে হেঁটে অল্প সময়ে এবং প্রায় বিনা খরচে কর্মস্থলে পৌঁছানো যায়। ঢাকার কর্মজীবী বস্তিবাসীদরে শতকরা ৭০ জন পায়ে হেঁটেই কাজে যায় বলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে।[২৫]

৬.০ বস্তিবাসীদের পেশা ও শহর উন্নয়নে তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা

বস্তিবাসীরা প্রধানত শ্রমজীবী মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক ও নারী, কিশোর-কিশোরী এমনকি শিশুও। এদের এক বিরাট অংশ রিক্সা ও বিভিন্ন পরিবহনের চালক ও মেরামতকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র শ্রমিক, গার্মেন্টস শিল্পের মহিলা শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী, হোটেল, রেস্তোরার কর্মচারী, ঘরে ঘরে ফেরী করা সহ নানা ধরনের ছোট ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি। সড়ক ও ভবনাদির জন্য নির্মাণ শ্রমিক, নানা রকম দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী, সাধারণ দিনমজুর ও মুটে, নানা রকম সরকারী, আধা সরকারী, প্রাইভেট অফিস-আদালতে নিম্ন পর্যায়ে নিযুক্ত চাকুরীজীবী, পারিবারিক বা গৃহকর্মে নিযুক্ত পূর্ণ সময় কিংবা খন্ডকালীন পরিচারিকা, আয়া, ঝি, মালী, দারোয়ন ইত্যাদি। অনেক শিশু এমনকি বয়স্করাও শহরের আবর্জনা ও ফেলে দেয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে যাদেরকে আমরা সবাই টোকাই বলে চিহ্নিত করি। অনেকে আবার এইসব আবর্জনা জাতীয় দ্রব্যাদির রিসাইক্লিং-এর কাজে নিযুক্ত। অর্থাৎ এরা সবাই আইন সঙ্গত শ্রমশীল কাজে নিয়োজিত। বস্তিবাসীদের মধ্যে সংখ্যক লোক অবশ্য নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপেও লিপ্ত। ভিক্ষুক, দেহপসারিণী, কালোবাজারী, স্মাগলার, পকেটমার, চোর, হাইজ্যাকার ইত্যাদি পেশাভুক্ত লোক নিশ্চয়ই আছে। তবে তুলনামূলকভাবে অবৈধ পেশাধারীদের সংখ্যা সমগ্রের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বস্তিবাসীদের অধিকাংশই দেশের শহরে অত্যাবশ্যকীয় সেবামূলক ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। যদিও এরা যে খাতে নিয়োজিত তাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বা ইনফরমাল সেক্টর না বলে এদেরকে ক্ষুদ্র উৎপাদন খাত বা ক্ষুদ্র সেবা খাত হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। শহরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্রে এদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরের উচ্চ ও বৃহদাকার পর্যায়ের শিল্প উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত ছোট ছোট কারখানা শ্রমিক ও মালিক হিসেবেও এরা বিরাট অবদান রাখছে। অর্থাৎ শহরের প্রডাকশন লিংকেজ, সার্ভিস লিংকেজ এবং ট্রেড লিংকেজ-এ বস্তিবাসী দরিদ্রদের ভূমিকা অসামান্য। সবেচেয় বড় কথা বস্তিবাসীরা সাধারণত নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করে থাকে, এক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের নিয়মাবলীর জটিলতা নেই।

৭.০ বস্তি সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে গ্রাম থেকে শহরে জীবিকার অন্বেষণে ছিন্নমূল মানুষের আগমন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া অতীতেও ছিল, বর্তমানেও চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। আমাদের দেশে নগরকেন্দ্রিক কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশের ফলে এই প্রক্রিয়া সম্প্রতি আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনইপি এবং ইউএনডিপি এর 'ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ১৯৯৭-৯৮ শীর্ষক যৌথ প্রকাশনায় দেখানো হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশ সমূহে প্রতিদিন গড়ে ১,৫০,০০০ লোক শহর অভিমুখী হচ্ছে। এই প্রকাশনার ভাষায় এটাকে একটি অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৬]

তবে এই ধাবমান স্রোতের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওর সহায়তায় এই সমস্যা সমাধানে নানা প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বস্তি সমস্যার যে সকল মৌলিক দিক এবং বিভিন্ন গবেষণা জরিপের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বস্তি সমস্যার সমাধান ও এর উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রাসংগিক বলে বিবেচনা করা যায় ঃ

(ক) বস্তি সমস্যা সুস্থ নগরায়নের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে প্রতিহত করছে, এজন্য এ সমস্যাকে জাতীয় আবাসিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সেই আলোকে একটি জাতীয় আবাসন নীতি প্রণয়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। এই নীতিতে বস্তি বাসীদের জন্য একটি বিশেষ আর্থিক ঋণ দেয়া আবশ্যক যাতে করে এই ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে একাধারে সরকার নির্ধারিত স্থানে স্বল্প ব্যয়ে একটি আবাসনের সুযোগ পেতে পারে, অপরদিকে স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে একটি কাজের সুযোগ পেতে পারে। হংকং এবং সিউলসহ তৃতীয় বিশ্বের বহু শহরে বস্তি বাসীদের এমন সুযোগ প্রদানের নজীর রয়েছে।

(খ) গ্রামীণ ব্যাংক এর অনুকরণে শহরে বস্তি বাসীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং প্রকল্প গ্রহণের জন্য "বস্তিবাসী ব্যাংক" প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনিসেফ, বিশ্ব ব্যাংক, সুইডিশ সিডা এবং নোরাড এর সহায়তায় ঢাকাসহ দেশের ২৫টি শহরে/পৌর এলাকায় ৪৫,০০০ বস্তি পরিবার উন্নয়নের জন্য ৯টি বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্প মূলত ১,৫০০ জন বস্তি মহিলাদের সমন্বয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে 'বস্তিবাসী ব্যাংক সৃষ্টি' এবং গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে ঋণ প্রথা চালু করতে চাইলে সম্ভবত উপর্যুক্ত দাতা সংস্থার পক্ষ হতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে।

(গ) সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা ব্যতীত এ ধরনের জাতীয় সমস্যার সমাধান উন্নয়নকমী দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়ন ও

বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয়। এ জন্য বস্তি সমস্যাকে শুধু একক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেই মুল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও অশিক্ষার মত জাতীয় সমস্যাকে গ্রাম ও শহরে একসাথে সমান গুরুত্বের সাথে সমাধা না করে শুধু শহরে বস্তি বাসীদের জন্য এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করলে গ্রামের ছিন্নমূল লোকের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বহুলাংশে বেড়ে যাবে। এজন্য এই সমস্যাটি গ্রাম এবং শহরে একত্রে বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি পৌর সভায় একটি বস্তি উন্নয়ন ও স্বল্পতায় আবাসন বিভাগ গঠন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মত স্বল্প উন্নত দেশে সরকারের পক্ষে যেহেতু এককভাবে বস্তি সমস্যা সমাধানসহ সামগ্রিকভাবে স্বল্প-আয় আবাসন নিরসন সম্ভব নয়, এজন্য ব্যক্তিমালিকানা উদ্যোগে স্বল্প আয় সম্পন্ন লোকের জন্য আবাসিক সুযোগ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে আবাসনকে একটি শিল্প হিসেবে বিচেনা করেছেন, এ কারণে এই শিল্পে অর্থাৎ স্বল্প আয় আবাসন শিল্পে বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করতে হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে ব্যক্তিমালিকানায় বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্প তৈরী হচ্ছে কিন্তু এই সকল আবাসন সুবিধা বস্তিবাসী বা স্বল্প আয় সম্পন্ন লোকের জন্য একটি উদ্যোগও দেশে এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক গৃহ নির্মাণ ও রিয়েল এষ্টেট কোম্পানীকে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম উন্নয়নে উৎসাহিত করতে হবে।

ঙ) বস্তি সমস্যা নিরসনে ও বস্তি উন্নয়নে দাতা সংস্থাসমূহ এবং দেশের বিভিন্ন এনজিওকে আরো বেশী অবদান রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

৮.০ উপসংহার

বস্তিবাসীদের অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন শহর গুলোতে নির্মাণ, শিল্প, কলকারখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। এদের পরিশ্রমের ফলে শহরের প্রতিটি সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সচল হয়ে আছে। মোট কথা একটি শহরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাদের পরিশ্রমের বদৌলতে আমাদের শহরগুলো সচল থাকছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ফলে একদিকে যেমন সূচিত হবে ছিন্নমূল মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন, অপরদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে করবে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ।

শহরমুখী জনস্রোত প্রতিহত না করা গেলে, শহরের হত দরিদ্র ও ভাসমান মানুষের যথাযথ পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না নেয়া হলে, আগামী কয়েক বৎসরের

মধ্যে আমাদের দেশের রাজধানী ঢাকাসহ সকল বড় বড় শহরগুলো সুস্থ, উন্নত জীবনবাসের অনুপেযোগী হয়ে পড়বে। এটা নিছক আশংকা নয় অভিজ্ঞতা লব্ধ বোধ ও দূরদর্শিতাজাত মন্তব্য। বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা জরিপে একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তাই এ সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। আর নেই বলেই আমাদের আরও সচেতন হতে হবে, সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই আলোকে বাস্তব সম্মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য গ্রাম ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমনভাবে, যাতে করে বৎসরের মাত্র কয়েকদিন কর্ম-সংস্থানের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকে। সর্বোপরি শহর মুখী প্রবণতা প্রতিরোধ কল্পে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করতে হবে শহরের সুযোগ সুবিধা, যাতে গ্রামের মানুষ গ্রামে থেকেই বেঁচে থাকার জন্য একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এরূপ একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে গ্রামের মানুষ গ্রামেই থাকতে চাইবে। ফলে গ্রাম থেকে শহরে আগমন প্রত্যাশিত মাত্রায় ঘটবে এবং একটা ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. United Nations, (1994) *World Urbanization Prospect* : New York.
2. Urban Development Directorate, (1974) *Squatters in Bangladesh Cities: A Survey of Urban Squatters in Dhaka.* Chittagong and Khulna, Dhaka University.
3. Nazrul Islam, (1976) *Squatters in Dhaka City; Center for Urban Studies.*
4. Ibid., P.123.
5. World Bank, (1991) *World Development Report.* 1991
6. Bangladesh Bureau of Statistics, (1991) *Bangladesh Population Census Report.*
7. Ibid. 48
8. Nazrul Islam, (1995) *"Urbanization and Urban Environment in Bangladesh"* in A Atiq Rahman et al edited, Environment and Development in Bangladesh, BCAS.
9. Ibid., P.335
10. Ibid., P. 339

11. United Nations, (1991) *Population of Bangladesh*. Country Monograph Series No.8, ESCAPE.

12. Ibid., PP. 23-34

13. Nazrul Islam, (1987) *"The Poor's Access to Residential Space in an unfairly structured* city Dhaka, in Oriental Geographers, Vol. 24, Vol.1.

14. Nazrul Islam and Amanatullah Khan, (1988) *"Increasing and Absorptive Capacity Asia: A Case study of Dhaka.* Bangladesh", in Regional Development Dialogue, Vol.9, No.4.

15. A. Minur Khan, (1990) *"Slums in Dhaka City"* Oriental Geographers, Vol. 25, No.172.

16. Ministry of Land, (1989) *Committee Report on the Problems of Squatters settlement of Dhaka City.*

17. Ibid., P. 15

18. Ibid., P. 39

19. Ibid., P.66

20. UNICEF, (1994) *Evaluation Study of slum Improvement Project*. LGED.

21. OP cit. 28.

22. Op. cit. 45.

23. ADB, (1996) *Urban Poverty Reduction Project LGED.*

24. World Bank, (1996) *World Resources 1996-97*. Oxford University Press.

25. Nasreen Khandaker et al. (1994) *"Urban Poverty in Bangladesh : Trends. Determinants and Policy Issues"* in Asian Development Review Vol. 12, No.1.

26. A. Q. M Mahbub & Nazrul Islam. (1991) *"The Growth of Slums in Dhaka City : A Spatio-Temporal Analysis"* in Sharifuddin Ahmed (edited) Dhaka : Past Present & Future,Asiatic Society of Bangladesh.

27. Ibid. P. 517.

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি প্রবণতা ঃ একটি সমীক্ষা

বেগম তাহ্‌মিনা আখতার *
বেগম মাজেদা হোসেন চৌধুরী **

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও চোরাচালান এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তা এখন কেবল উন্নত বিশ্বের অন্যতম প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্যেও তা ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের এক ব্যাপক অংশ এই সমস্যার ব্যাপারে বিশেষত নিয়মিত মাদকদ্রব্য ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া এবং ব্যবহারকারী, তাঁর পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কারণ মাদকদ্রব্য কেবলমাত্র মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্ভরশীল করে দেয় না বরং পরিবার ও সমাজের জন্য বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি, সনাতন মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আদর্শের বিপর্যয়, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও জাতীয় অর্থনীতির প্রতি হুমকি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠমোর মধ্যে অস্থিতিশীলতা বিশেষ করে এই আত্মবিধ্বংসী নেশা যুব সমাজের এক বিরাট অংশের কর্মশক্তি, উদ্দীপনা, মূল্যবোধ, সচেতনতা ছিনিয়ে নিচ্ছে। মানব সৃষ্ট এই দূর্যোগের ভয়াবহতা এইড, ক্যান্সার, ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির চেয়ে অনেক ভয়ংকর। আর তাই হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতার উচ্চ পর্যায় থেকে উদ্বেগ প্রকাশিত হয় যে, "আমাদের জনগণের কাছে মাদকদ্রব্য পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়েও অধিকতর আসন্ন বিপদ। মাদকদ্রব্য আমাদের সামাজিক ভিত্তিতে ভূমিকম্প ও বন্যার চেয়েও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।"[১]

এই উদ্বেগের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রমবর্ধমান মাদক সম্পর্কিত মটর দুর্ঘটনা, কর্মস্থলে অঘটন, শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা, অন্যান্য পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা,

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাস্থ্য সমস্যা; যার মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় জটিলতা, মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষের নেশাগ্রস্ত হওয়ার রিপোর্ট করেছে।[২] বৃটিশ ল্যানসেস্ট মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত (২২শে মে ১৯৯১) এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, উন্নত বিশ্বের এক পঞ্চমাংশের বেশী মানুষ ধূমপানের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করবে। উন্নত বিশ্বে জনসংখ্যা ১২৫কোটি, এর এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২৫ কোটিই শুধু ধূমপান জনিত কারণে মারা যাবে। অন্যদিকে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি লাগোসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, তামাকবাহিত রোগে তৃতীয় বিশ্বে বছরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা যায়। ধূমপানের ন্যায় হালকা নেশাশক্তি যদি এরূপ ভয়াবহ পরিণতির কারণ হতে পারে, তবে হিরোইন, প্যাথেড্রিন, মারফিন, কোকেন, মারিজুয়ানা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে সারা বিশ্বে কিরূপ মারাত্মক বিভীষিকা সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।[৩] '৮৯ সালে মাদকের বিক্রয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে কলাম্বিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট 'বার্ক' বিশ্বজনমতের সমর্থন প্রত্যাশায় প্রদত্ত এক ভাষণে ঘোষণা করেন, "There are no national boundaries in the fight against drugs. There are no safe heaven from the narcoterrorism."[৪]

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নামক যে মহামারী পৃথিবী নামক গ্রহটাকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে চলেছে, বিশ্বের ৪র্থ দরিদ্রতম দেশ হয়েও বাংলাদেশ এর থেকে নিস্তার পায়নি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাই এই বিপত্তির মূল নিয়ামক। বাংলাদেশের পূর্বদিকে বার্মা, লাওস ও থাইল্যান্ডের সীমান্ত সম্মিলন কেন্দ্রস্থিত বাংলাদেশের প্রায় সমআয়তন বিশিষ্ট দুর্গম পার্বত্য এলাকার মাদক উৎপাদন, গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, উত্তরে ভারত, নেপাল ও ভূটান সীমান্ত এলাকায় অধুনা বিকশিত মাদক উৎপাদন কেন্দ্র 'গোল্ডেন ওয়েজ' এবং পশ্চিমে বিশ্বের বৃহত্তম বৈধ আফিম উৎপাদক দেশ ভারত এবং আরও পশ্চিমে পাকিস্তান, আফগান সীমান্তস্থিত 'গোল্ডেন ক্রিসেন্টে'র অবস্থিতি। বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম এই জনগোষ্ঠীকে আক্ষরিক অর্থেই মাদক অভিশাপে সবচেয়ে বেশী বিপন্ন করে তুলেছে।[৫]

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'ক্রসরোড' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে এদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং মাদকাসক্তদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর মধ্যে সিংহভাগ হচ্ছে এ জাতির সম্ভবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল অংশ, অর্থাৎ ১৫-৩০ বৎসরের যুবক ও ছাত্র (প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলও তাই সমর্থন করে)। সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে

এদেশে মাদকাসক্তদের প্রকৃত সংখ্যা জানা না গেলেও একমাত্র ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরের এলাকায় ২০,০০০ এর মতো মাদকাসক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৬] ঢাকা সহ দেশের বড় বড় শহরে উচ্চ মধ্যবিত্তের তরুণদের মধ্যে হিরোইন আসক্তির হার বেশী হলেও গ্রামাঞ্চলে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় এর ব্যাপকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই সাতটি জেলায় হিরোইনের বিষক্রিয়ায় পাঁচশত আঠারজন মৃত্যুবরণ করেছে। আরও আট হাজারের বেশী লোক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এবং এই সব অঞ্চলে ক্রমাগত মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের সংখা বাড়ছে।[৭] অন্যান্য তথ্যানুযায়ী কেবল চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১২,০০০ হিরোইন আসক্ত এবং পাবনা জেলায় হিরোইন আসক্তদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধির পলে প্রায় ২৫,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানা যায়। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে বাংলাদেশে সর্বমোট ১ লাখ হিরোইনসেবী রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিককালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন নগরীতে মদ্যপান অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার লাইসেন্স প্রাপ্ত মদ্যপায়ীদের মাঝে প্রায় ৪০,০০০ হলো তরুণ বয়সী। প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সমুদয় মাদকাসক্তদের সংখ্যা দশ লক্ষাধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।[৮]

ফলে বিশ্বময় প্রসারিত মাদকদ্রব্যের হিংস্রতা এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর উপর সৃষ্টি করেছে মারাত্মক বহুমুখী প্রতিক্রিয়া। আসক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ড্রাগসের প্রতি নির্ভরশীলতা বা পারিবারিক গন্ডিতে বিষয়টি আর সীমাবদ্ধ নেই। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেহেতু পরিবারের বাইরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, সামাজিক সংগঠন ও কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত থেকে জীবন যাপন করে, তাঁর আসক্তির প্রভাব উল্লেখিত কাঠামোগুলির উপরও পড়ে।

তাছাড়া মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতার মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতা পাশাপাশি চলে।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের গতি/প্রকৃতি নিরীক্ষণে দেখা যায় যে, এক এক সময়ে এক এক মাদক নেশা রাষ্ট্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছে বা নেতৃত্ব দিয়েছে। যেমন ৭৪ সালে গাঁজা, ৮১ সালে মদ, ৮৩তে মৃত্যু সঞ্জীবনী সুরা, ৮৬ থেকে ৯০তে হিরোইন, ৯০-৯২ তে ফেনসিডিল। মাদকের নেশার জগতে ফেনসিডিলের এই জনপ্রিয়তা ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে আসা পণ্যের তালিকায় শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। মাদকের অপব্যবহারের জগতে আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো

সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে হিরোইনের পরিবর্তে ফেনসিডিল ব্যবহারের প্রবণতা যেমন একদিকে বাড়ছে অন্যদিকে অশিক্ষিত, নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে হিরোইন গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে। তবে হিরোইনের যেমন এক সময়ে মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে আধিপত্য ছিল তেমনি বর্তমানে ৯২-৯৩তে কোকেনও আধিপত্য বিস্তার করেছে।

গত ৪ বছরে দেশে হিরোইন ব্যবহারের হার শতকরা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে হিরোইনসেবীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। অন্যদিকে ১৯৮৩ সাল থেকে হিরোইনকে ডিঙ্গিয়ে ফেনসিডিল এর অপব্যবহার শুরু হয়। ধারণা করা হয় বর্তমানে কমপক্ষে ৩০ লাখ লোক নিয়মিত ফেনসিডিল সেবন করে। এদের বয়স ১৪-১৫ বৎসরের মধ্যে। ১৯৮৩ সালে ঔষধ নীতির আওতায় ফেনসিডিল উৎপাদন নিষিদ্ধ হবার পর ভারতের রোন পোলেনক কোম্পানী উৎপাদিত ফেনসিডিল চোরাপথে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। সমগ্র বাংলাদেশে ফেনসিডিল বিক্রির প্রায় আড়াইশ' আস্তানা রয়েছে।

বাংলাদেশে অতীতে কখনও কোকেন চোরাচালান বা কোকেন ব্যবহার দেখা যায়নি।কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন আবাসিক হোটেল ও কুটনৈতিক এলাকার আশেপাশে কোকেন কেনা বেচার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিরোইন মূলত ধূমপানের মাধ্যমে ব্যবহার করা হত বলে এর বিষময় ফসল এইড্স এখনও বাংলাদেশে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু এ যাবত যে কোকেন ধরা পড়েছে তার সবই ইনজেকটেবল ফর্মের। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে সিরিঞ্জের সাহায্যে হিরোইনের ব্যবহার এবং হিরোইনের সহধর্মী ড্রাগ টিডিজেসিক ইনজেকশন এর ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে এর রোগীদের ৭০% নিডল কালচার বা ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহার থেকে এসেছে। বাংলাদেশে টিডিজেসিক, ইনজেকটেবল হিরোইন ও কোকেনের অনুসঙ্গী হিসেবে যদি আসে "নিডল কালচার", তবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে আমেরিকা ও ইউরোপের মত এইড্স এর ভয়াবহ মহামারী। [৯]

ঢাকাস্থ "আন্তর্জাতিক তথ্য কেন্দ্র" কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত "The united Nations and Drug abuse control" শীর্ষক পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, " It is estimated that from 10 to 20 percent of AIDS patients are intravenous drug abusers. A much higher percentage are regular users of a variety of illicit drugs such as marijuana and cocaine which are known to suppress the users immune system." [১০]

মাদকদ্রব্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে উক্ত পুস্তিকায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, The most commonly abused drug varies from time to time but at present it is still connabis, the marijuana "Joint" which is smoked world wide use of other drugs is more regional. The growing popularity of cocaine and its abuse in epidemic proportions in North and South America and some part of Europe and Asia was noted in the report of the International Narcotics Control Board for 1988. A more potent from of cocaine known as "Crack" is producing a new wave of drugs addiction is the Unites Sates. In coca producing countries urban youth are smoking small brown rolls of coca pasts mixed with tobacco a habit that is spreading throughout rural areas in most countries where the coca bush in known. [১১]

দেশে বিরাজমান মাদকদ্রব্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দারিদ্রের চাইতেও ভয়াবহ এবং পারমাণবিক যুদ্ধের চাইতেও ঝুকিপূর্ণ। এ ধরনের ব্যয়বহুল দ্রুত প্রসারমান সমস্যা হতে সমাজকে সুস্থ করতে হলে প্রয়োজন এ সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সমস্যার ভয়াবহতা নির্ণয় এবং সঠিক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন। এ ধরনের গবেষণা বর্তমানকাল পর্যন্ত সীমিত গন্ডিতে রয়ে গেছে। তাই মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মাদক দ্রব্য সম্পর্কিত তথ্য এবং এর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথার্থ। এ ধরনের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে বিরাজমান অবস্থার চিত্র নিরূপণ এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যেই বর্তমান সমীক্ষাটি সীমিত আকারে সম্পাদন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মাদকাসক্তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মাদকদ্রব্য এবং এর গতি প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটনই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য (Specific Objectives) সমূহ হচ্ছে ঃ

(ক) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।

(খ) মাদকাসক্তদের মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী অনুসন্ধান।

(গ) মাদকাসক্তের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটন।

গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বারাকা) কে সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর পেছনে যুক্তি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সরকারীভাবে একমাত্র এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশে মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বারাকা) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৪০ জন রোগীর মধ্যে ৩০ জন রোগীকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ (তথ্য সংগ্রহকালে শয্যাশায়ী ছিল) করা হয়েছে। তাছাড়া মাদকাসক্তির গতি ও প্রকৃতি জানার জন্যে ১৯৯০-৯১ এবং ৯২ সালে ভর্তিকৃত উল্লেখিত দু'টি প্রতিষ্ঠানের সকল রোগীকে নমুনা হিসেবে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় সামাজিক জরীপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করা হয়। সরাসরি সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরিসংখ্যানগত পরিমাপের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান সমীক্ষার বিষয়টি যথার্থভাবে নিরূপণ করার জন্যে বাংলাদেশে যে সব প্রতিষ্ঠান মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানকে এই গবেষণার আওতাভুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজস্ব খরচে সমীক্ষা পরিচালিত বলে ও সময়ের স্বল্পতার জন্যে তা সম্ভব হয়নি।

প্রাপ্ত ফলাফল ও আলোচনা

মাদকাসক্তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সরাসরি উত্তর দাতার কাছে থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও ১৯৯২ সালে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং বারাকায় ভর্তিকৃত আসক্ত ব্যক্তিদের উপাত্ত বিশ্লেষণ (সারণিবদ্ধকরণ) করা হয়েছে। মাদকাসক্তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য তাদের বয়স, শিক্ষা, পেশা, আয়, বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো ঃ

মাদকাসক্তদের বয়স (সারণি-১)

বয়সের ভিত্তিতে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের গড় বয়স সম্মিলিতভাবে (মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র+বারকা+জরীপ) হচ্ছে ২৭.৬৬ বৎসর। এক্ষেত্রে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

২৭.১৪ বৎসর, বারাকা ২৭.২০ এবং জরীপ ২৮.২১ বৎসর। মাদকাসক্তদের বয়সের শতকরা বিন্যাসে দেখা যায় যে অধিকাংশ মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের বয়স হচ্ছে ১৫-৩০ বৎসর বয়ঃসীমার মধ্যে। এক্ষেত্রে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে শতকরা ৭৫.৭৮ জন, বারাকায় শতকরা ৭২.২২ জন এবং জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শতকরা ৬৩.৩৩ জন। সম্মিলিতভাবে ১৫-৩০ বৎসরের মধ্যে ৬৩৬ জনের মধ্যে ৪৭৭ জনই অর্থাৎ শতকরা ৭৫ জনই এ শ্রেণীভুক্ত। ৩১-৪০ বৎসর এবং ৪০-তদূর্ধ্ব বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে শতকরা ২০.৯১ জন এবং ৪.০৮ জন। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে সহজেই অনুমেয় যে ভবিষ্যত প্রজন্ম হিসেবে চিহ্নিত যুব সম্প্রদায় মাদকের কাছে হারিয়ে ফেলছে তাদের নিজস্ব সত্ত্বা।

মাদকাসক্তদের শিক্ষা (সারণি-২)

৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে এস. এস. সি. পর্যন্ত পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে মাদকাসক্তদের সংখ্যা সর্বাধিক বলে বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে। যদিও পৃথক পৃথকভাবে মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে একাদশ-স্নাতক পর্যায়ে ২৯.১২%, বারাকাতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী-এস. এস. সি. পর্যন্ত ৫২.৭৮% এবং জরীপে নিরক্ষরদের মধ্যে ৩৬.৩৩%। লক্ষ্যণীয় যে, সকল তথ্যেই ৬ষ্ঠ শ্রেণী-এস.এস.সি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য মাদকাসক্তির সংখ্যা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, বারাকা এবং জরীপের প্রাপ্ত ফলাফল হচ্ছে যথাক্রমে ২৮.৭৭%, ৫২.৭৮% এবং ২৬.৬৭%। শিক্ষা সচেতনতা এবং সামাজিক মর্যাদার কারণে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসক্তের সংখ্যা সবচাইতে কম (১.৭৩%)।

মাদকাসক্তদের পেশা (সারণি-৩)

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, মাদকাসক্তদের মধ্যে বেকারের সংখ্যাই সর্বাধিক। সমীক্ষায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এবং জরীপের সম্মিলিত ফলাফলে দেখা যায় যে, বেকারের সংখ্যা ৬০০ জনের মধ্যে ১৯৬ জন (৩২.৬৭%)। মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে চাকুরীচ্যুত হয়ে যেমন অনেকে বেকার হয়েছে; আবার বেকারত্বের কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়েও অনেকে মাদকাসক্ত হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যাচ্ছে যে, বেকারের পরেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে (মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্র+জরীপ) শতকরা ২৩.৫ জন মাদকাসক্তের পেশা হচ্ছে ব্যবসা। শ্রমিক এবং ছাত্রের সংখ্যা হচ্ছে ১৫.৮৩ জন ও ১০.৬৭ জন। উল্লেখ্য যে, পেশাভিত্তিক শ্রেণী বিভাজনে সবচাইতে লক্ষ্যণীয় বিষয় কৃষিজীবী শ্রেণী (১৫%) হচ্ছে কম মাদকাসক্ত।

মাদকাসক্তদের আয় (সারণি-৪)

পেশা এবং আয় পরস্পর সম্পর্কিত প্রত্যয়। এক্ষেত্রে মাদকাসক্তদের গড় আয় হচ্ছে ৩১৬৬.৬৭ টাকা। আয়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজনে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার কোন আয় নেই, এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২৬.৬৭ জন। অবশ্য পূর্ববর্তী পেশার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক বলে এরূপ ফলাফল আসাই স্বাভাবিক। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০০০- তদূর্ধ্ব আয় করেন এরূপ উত্তরদাতাদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য (২৩.৩৩%)। ১০০০-২০০০ এবং ২০০০-৪০০০ টাকার মধ্যে আয় করেন এরূপ মাদকাসক্তদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ২০.০০ জন এবং ১৩.৩৩ জন (সারণি-৪)।

মাদকাসক্তদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, অবিবাহিতদের মধ্যে মাদকাসক্তদের সংখ্যাই অধিক। প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র শতকরা ৫০.১৭ জন, বারাকায় শতকরা ৬৩.৮৯ জন এবং জরীপে শতকরা ৩০ জনই অবিবাহিত। সম্মিলিতভাবে অবিবাহিতদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫০ জন। উল্লেখিত পর্বে বয়সের প্রাপ্ত উপাত্তে ২১-৩০ বৎসর বয়সের মাদকাসক্তির সংখ্যার আধিক্য (সারণি নং-১) নিশ্চিত করে যে, অবিবাহিত মাদকাসক্তের সংখ্যা বেশী। অবশ্য বিবাহিত মাদকাসক্তদের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৬.২৬ জন। এছাড়া বিপত্নীক/বিচ্ছেদ, তালাক প্রাপ্তাদের সংখ্যা হচ্ছে সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে শতকরা ০.৪৭, ২.৩৬ জন ও ০.৯৪ জন।

মাদকাসক্তদের মাদকাসক্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী

মাদকাসক্তদের মাদকাসক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীতে প্রাপ্ত উপাত্ত মাদকাসক্তি এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনার জন্ম দিয়েছে। মাদকাসক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর মধ্যে মাদকাসক্তদের মাদক দ্রব্যের সেবনের সময়, বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবনের শ্রেণীবিভাগ, দৈনিক মাদকদ্রব্য গ্রহণের পিছনে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ, অর্থ প্রাপ্তির উৎস এবং মাদকাসক্তদের সম্পূর্ণ নেশা ছেড়ে দেয়ার মতামত ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাপ্ত উপাত্তের ফলাফলের কিছু কিছু অংশ, যেমন পূর্বের গবেষণাগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ও উদ্বেগজনক ফলাফলও পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রে উপাত্তগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়েছে বিধায় জরীপের ৩০ জন উত্তরদাতার প্রাপ্ত তথ্য এখানে বিশ্লেষণ করা হলো।

মাদকাসক্তদের মাদকদ্রব্য সেবনের সময়কাল (সারণি-৫)

সারণি-৫ এ দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ৪০ জন রোগীর মধ্যে ৩০ জন রোগীর উপরে পরিচালিত জরীপের ফলাফল অনুযায়ী শতকরা ৪৬.৬৭ জন উত্তরদাতাই ৪ বৎসর ও তদূর্ধ্ব সময় ধরে মাদকদ্রব্য সেবন করছে। ২-৩ বৎসর যাবৎ মাদকদ্রব্য সেবন করছে এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে ১৬.৬৭ জন। শতকরা ২৩.৩৩ জন উত্তর দাতা ০-২ বৎসর যাবৎ মাদকদ্রব্য সেবন করছে। মাদকাসক্তদের মাদকদ্রব্য গ্রহণের গড় সময়কাল হচ্ছে ৩.২ বৎসর।

যেহেতু বারাকাতে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পেশা ও আয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়নি এবং মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আয়ের রেকর্ড সংগৃহীত নেই, তাই এই বিষয়ে উপাত্ত উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবনের শ্রেণী বিভাগ (সারণি-৬)

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হিরোইন এর নীলনেশার অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমশ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হিরোইন চোরচালানের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কারণে মাদকাসক্তদের মধ্যে হিরোইন আসক্তদের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় মাদকাসক্তদের শতকরা ৪০.০০ জনই হিরোইন আসক্ত। এরপরেই ফেনসিডিলের অবস্থান। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২০.০০ জন (সারণি-৬ দ্রষ্টব্য)। ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে আসা এই সিরাপের আক্রান্তের হার আরো বেশী বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মনে করেন। কেননা হিরোইন সেবীদের মত ফেনসিডিল সেবীরা হাসপাতালে অথবা নিরাময় কেন্দ্রের সহায়তা ছাড়াও ভাল হতে পারে। ফলে প্রকৃত সংখ্যা আরো অধিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঘুমের বড়ি ও গাঁজায় আসক্তদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ১০.০০ জন ও ১৩.৩৩ জন।

দৈনিক মাদকদ্রব্য গ্রহণের পেছনে ব্যয়িত অর্থ ও অর্থ প্রাপ্তির উৎস (সারণি-৭)

মাদকদ্রব্য গ্রহেণর পেছনে ব্যয়িত অর্থের ক্ষেত্রে ৩০ জনের উপর পরিচালিত ফলাফল অনুশীলনে দেখা যাচ্ছে যে, গড়ে ১৮৫.৮৩ টাকা দৈনিক ব্যয় করে। সর্বাধিক সংখ্যক মাদকাসক্ত ব্যক্তি ৫০-১০০ টাকার মধ্যে ব্যয় করে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩০ জন। ১০০-২০০ টাকার মধ্যে ব্যয় করে এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২৬.৬৭ জন। শতকরা ২০ জন দৈনিক ২০০-৪০০ টাকার মাদকদ্রব্যের জন্য ব্যয় করে থাকে এবং ০-৫০ টাকা ব্যয় করে এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৬ জন। সর্বনিম্ন খুব কম উত্তরদাতাই জানিয়েছে ৪০০-তদূর্ধ্ব

টাকা দৈনিক ব্যয় করে মাদকদ্রব্যের পেছনে, এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১০.০০ জন। উপর্যুক্ত ফলাফল অনুসারে সহজেই অনুমান করা যায়, মাদকদ্রব্য গ্রহণের পেছনে দৈনন্দিন ব্যয়িত অর্থ নিতান্তই কম নয়-যা কিনা বেকার যুবকের পক্ষে এই অর্থ যোগানোর জন্য বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে হয়।

মাদকদ্রব্য গ্রহণের পেছনে অর্থ প্রাপ্তির উৎসের ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা যদিও বলে থাকে যে নিজস্ব উপার্জনের অর্থের বিনিময়েই তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। যদি নিজস্ব উপার্জন করেও থাকে, তবে তা বৈধ নয়। প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ২১ জন (৩৮.৮%) উত্তরদাতাই নিজস্ব উপার্জনের কথা উল্লেখ করলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ মাদকাসক্তদের পেশার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অধিকাংশই উত্তরদাতা বেকার (সারণী-৩)। শতকরা ২০জন জানিয়েছে পরিবার থেকে এবং শতকরা ২৯.০৯ জন উত্তরদাতা ঋণ করে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে। ছিনতাই ও অসামাজিক কর্মের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১.৮২ জন।

বাংলাদেশে মাদকাসক্ত এবং মাদকাসক্তির গতি প্রকৃতি

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের গতি/প্রকৃতি নিরীক্ষণে দেখা যায়, এক এক সময় এক এক ধরনের মাদক নেশার রাজ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যেমন ৭৪ সালে গাঁজা, ৮৯ সালে মদ, ৮৩তে সুরা, ৮৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত হিরোইন, ৯০-৯৭তে ফেনসিডিল। বর্তমানে মাদকের বাজারে হিরোইন ও ফেনসিডিল সমান আধিপত্য নিয়ে অবস্থান করলেও হিরোইনের অসম্ভব নিম্নগতি হিরোইনের বাজারে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একই সাথে ফেনসিডিলের সহজলভ্যতা ও সরবরাহের প্রাচুর্য এবং নেশার সহজ উপায় ও স্বাদে বৈচিত্র্য, সর্বোপরি যুবসমাজের মধ্যে ফ্যাশন ও নতুনের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক, ফেনসিডিলকে অধিকতর জনপ্রিয় মাদকে পরিণত করেছে। বর্তমানে ঢাকা শহরে হিরোইন উচ্চ মধ্যবিত্তের আসক্তের চেয়ে ফেনসিডিল এখন সকলের কাছে বেশী জনপ্রিয়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে সকল মানুষের মধ্যে হিরোইন আসক্তের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই গবেষণার মাদকাসক্তির গতি প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও বারাকার তিন (৩) বৎসরের ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা, আসক্তির শ্রেণী বিন্যাস, পুনরায় রোগীর আক্রান্তের সংখ্যা, ৩ বৎসরের গ্রাম ও শহরভেদে এবং ধর্ম ভেদে রোগীর সংখ্যা, বিবেচনায় আনা হয়েছে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশে মাদকাসক্ত এবং মাদকাসক্তির গতি - প্রকৃতির একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

এতদসংক্রান্ত আলোচনা ও ফলাফল নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

৩ বৎসরে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও বারাকায় ভর্তিকৃত রোগী (সারণি-৮)

১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে এই ২টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত রোগীর হার বিবেচনায় দেখা যায়, মাদকাসক্ত ও মাদকাসক্তির গতি প্রকৃতি নিম্নদিকে ধাবিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠানে বিগত তিন বৎসরে (১৯৯০, ৯১, ৯২) সর্বমোট ২, ৭১৫ জন ভর্তি হয়েছিল, তম্মধ্যে ১৯৯০সালে ৪২.৩৩% ১৯৯১ সালে ৩৫.৪৩% এবং ১৯৯২ সালে ২২.২৩% ভর্তি হয়েছিল (দ্রষ্টব্য সারণি-৮)। তবে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণের মতে প্রকৃত পক্ষে মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এ বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্র ও বারাকার আসক্তদের মাদক দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ (সারণি-৯)

বিগত ৩ বৎসরের মাদকাসক্তদের মাদকদ্রব্যের আসক্তির মধ্যে হিরোইন ও ফেনসিডিলের হার সর্বাধিক। এক্ষেত্রে ২টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত ১৯৯০, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে ভর্তিকৃত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮৬.০৬% জন ৮২.৮১ জন এবং ৫৪.৪৬ জন ছিল হিরোইন আসক্ত। অন্যদিকে ফেনসিডিলের আসক্ত সংখ্যা ১৯৯০ সালে শতকরা ১.৯৯ জন, ১৯৯১ সালে শতকরা ৪.৩৪ এবং ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৪.০২ জনে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, মাদকদ্রব্য আসক্তির ক্ষেত্রে হিরোইনের তুলনায় শহরে ফেনসিডিলের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসক্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ভর্তিকৃত রোগীদের শতকরা ৩.৪৪ জন প্যাথেড্রিন, শতকরা ৫.৭ জন পলিড্রাগস, শতকরা ১.০১ এ্যালকোহল এবং শতকরা ৩.৩৩ জন গাঁজায় আসক্ত ছিল।

৩ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা শেষে পুনরায় আক্রান্ত হবার বিবরণ

বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে দুটো প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা সমাপ্তির পর পুনরায় আক্রান্ত রোগীদের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে এই হার ছিল সর্বনিম্ন (২২.১১%)। ১৯৯১ সালে এই হার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শতকরা ৪১.৯১ জনই পুনরায় ২টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিল। তবে ১৯৯২ সালে এই হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে (৩৫.১৭%)। পুনরায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গবেষণালব্ধ তথ্যে নিম্নগতি, যা কিনা সামগ্রিক মাদকাসক্তি ও মাদকাসক্তের গতি, প্রকৃতির পরিবর্তনের ইতিবাচক দিক নির্দেশক।

বিগত ৩ বৎসরে দুটো প্রতিষ্ঠানে গ্রাম-শহরভিত্তিক আসক্তরোগী

বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ের লক্ষ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের বিগত ৩ বৎসরের গ্রাম-শহর ভিত্তিক রোগীর সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এ ধরনের হিসাব না থাকায় শুধুমাত্র বারাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হলো। ৩ বৎসরে বারাকাতে ভর্তিকৃত মোট ১৩৩ জন রোগীর মধ্যে শতকরা ১৫.০৪% গ্রামে এবং ৮৪.৯৬% শহরে বসবাসরত। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, গ্রামাঞ্চলে ১৯৯০ সালের তুলনায় (২১.৭৩%) ১৯৯১ সনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদকাসক্তের সংখ্যা হ্রাস পেলেও (৭.৮৪%) ১৯৯২ সালে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে (১৬.৬৭%), যা মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে নেতিকবাচক ফলাফলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ধর্মভেদে মাদকাসক্তদের শতকরা বিন্যাস

বিগত ৩ বৎসরে ধর্মভেদে মাদকাসক্তদের শ্রেণীবিন্যাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এবং বারাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মভেদে মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তুলনামূলকভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই অধিক মাদকাসক্ত। ১৯৯০, ৯১ ও ৯২ সালে ২টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত মোট ২৭২৬ জনের মধ্যে ২৬৩২ জনই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ ৯৫.৫৫%।

যদিও বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বেশী; তাই মুসলিম, এর পরই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান। কেননা খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫ ভাগেরও কম হওয়া সত্ত্বে প্রাপ্ত গবেষণা ফলাফলে ০.৮০ ভাগ মাদকাসক্তই খ্রীষ্টান এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মাদকাসক্ত হওয়ার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মাদকাসক্ত নেই বললেই চলে (০.০৩%)। পক্ষান্তরে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা কম এবং ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

উপসংহার

মাদকদ্রব্যের সর্বগ্রাসী আক্রমণ কেবল ড্রাগনির্ভর ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে না; বরং সমগ্র সমাজকাঠামোর ভিত্তিকে পঙ্গু করছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হিসেবে আর কালক্ষেপণ না করে আগামী প্রজন্ম ও সমাজকে মাদকদ্রব্যের হিংস্র ছোবল থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যক্তিগত/পারিবারিক/স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাবলীর সমন্বয় সাধন করে বাস্তবমুখী কার্যক্রম প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেহেতু বেশী কার্যকর, সেহেতু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এর ক্ষেত্রে

কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ, ব্যবহারিক জ্ঞান বিস্তার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, নিজস্ব মূল্যবোধ সৃষ্টি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ করতে হবে। সর্বপোরি সমাজে মাদকরোগ বিস্তাররোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন সমধিক।

সারণি-১
বয়সের ভিত্তিতে মাদকাসক্তদের শতকরা বিন্যাস

বয়সের শ্রেণী বিন্যাস	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (=৫৭০)	বারাকা= (৩৬)	জরীপ (=৩০)	মোট শতকরা হার
১৫-২০ বৎসর	৭০ (১২.২৮)	৬(১৬.৬৭)	৪(১৩.০০)	৮০(১২.৫৮)
২১-৩০ বৎসর	৩৬২)৬৩.৫০)	২০(৫৫.৫৫)	১৫(৫০.০)	৩৯৭(৬২.৪২)
৩১-৪০ বৎসর	১১৪(২০.০০)	৯(২৫.০)	১০৯৩৩.৩৩)	৩৩(২০.৯১)
৪০-তদূর্ধ্ব	২৪)০৪.২১)	১(২.৭৮)	১(৩.৩৩)	২৬(৪.০৮)
মোট	৫৭০(১০০.০০)	৩৬(১০০.০০)	৩০(১০০.০০)	৬৩৬(১০০.০০)
গড় বয়স	২৭.৩৪ বৎসর	২৭.২১৯ বৎসর	২৮.৪২ বৎসর	২৭.৬৬ বৎসর

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।)

সারণি-২
শিক্ষার ভিত্তিতে মাদকাসক্তদের শতকরা বিন্যাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাদক নিরাময় কেন্দ্র (=৫৭০)	বারাকা (৩৬)	জরীপ (=৩০)	মোট শতকরা হার
নিরক্ষর	১২৫(২১.৯৩)	৬(১৬.৬৭)	১১(৩৬.৩০)	১৪২(২২.৩৩)
১ম শ্রেণী-৫ম শ্রেণী	৯৯(১৭.৯৭)	৬(১৬.৬৭)	৩(১৯.০০)	১০৮(১৬.৯৮)
৬ষ্ঠ থেকে-এস.এস.সি	১৬৪(২৮.৭৭)	১৯(৫২.৭৮)	৮(২৬.৬৭)	১৯১(৩০.০০)
একাদশ-স্নাতক	১৬৬(২৯.১২)	৫(১৩.৮৯)	৭(২৩.৩৩)	১৭৮(২৭.৯৯)
স্নাতকোত্তর	১০(১.৭৪)	০	১(৩.৩৩)	১১(১.৭৩)
অন্যান্য	৬(১.০৫)	০	০	৬(০.৯৪)
মোট	৫৭০ (১০০.০০)	৩৬ (১০০.০০)	৩০(১০০.০০)	৬৩৬(১০০.০০)

সারণি-৩
পেশার ভিত্তিতে মাদকাসক্তদের শতকরা বিন্যাস

পেশা	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	জরীপ(=৩০)	মোট শতকরা হার
কৃষি	৭(১.৩)	২(৬.৬৭)	৯(১.১৫)
শ্রমিক	৯৪(১৬.৪৯)	১(৩.৩৩)	৯৫(১.৮৩)
ব্যবসা	১২৭(২২.২৮)	১৪(৪৬.৬৭)	১৪১(২৩.৫)
চাকুরী	৫৫(৯.৬৫)	৭(২৩.৩৩)	৬২(১০.৬৭)
ছাত্র	৬০(১০.৫৩)	৪(১৩.৩৩)	৬৪(১০.৬৭)
অন্যান্য		০(০)	৩৬(৫.৫)
মোট	৫৭০(১০০)	৩০(১০০)	৬০০(১০০)

* পেশা সম্পর্কিত তথ্য বারাকা থেকে পাওয়া যায়নি বলে সারণিতে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

সারণি-৪
আয়ের ভিত্তিতে উত্তর দাতাদের শতকরা বিন্যাস

মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার
আয় নাই	০৮	২৬.৬৭
১০০০-২০০০	০৬	২০.০০
২০০০-৪০০০	০৪	১৩.৩৩
৪০০০-৬০০০	০৫	১৬.৬৭
৬০০০-তদুর্দ্ধ	০৭	২৩.৩৩
মোট	৩০	১০০.০০

গড় আয় = ৩১৬৬.৬৭ টাকা

* আয় সম্পর্কিত তথ্য উভয় প্রতিষ্ঠানে রেকর্ডভুক্ত নেই বিধায় তথ্য উপস্থাপন করা যায়নি।

সারণি-৫
মাদকাসক্তদের মাদক দ্রব্য সেবনের সময়কালের বিবরণ

(কেবল উত্তরদাতাদের) (N=৩০)

সময়কাল (বৎসর হিসাবে)	সংখ্যা	শতকরা হার
০-১ বৎসর	০৪	১৩.৩৩
১-২ বৎসর	০৩	১০.০০
২-৩ বৎসর	০৫	১৬.৬৭
৩-৪ বৎসর	০৪	১৩.৩৩
৪- তদুর্ধ্ব বৎসর	১৪	৪৬.৬৭
মোট	৩০	১০০.০০

সারণি-৬
বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবনের শ্রেণী বিভাগ

(কেবল উত্তরদাতাদের) (N =৩০)

মাদকদ্রব্যের নাম	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হিরোইন	১২	৪০.০০
প্যাথেড্রিন	০৩	১০.০০
ফেনসিডিল	০৬	২০.০০
গাঁজা	০৪	১৩.৩৩
ঘুমের বড়ি	০২	৬.৬৭
এ্যালকোহল	০২	৩.৩৩
টি, টি, জি, সি,	১১	৩৬.৬৭
মোট	৩০	১০০

সারণি-৭

মাদকদ্রব্য গ্রহণের পেছনে উত্তরদাতাদের দৈনিক ব্যয়ের শতকরা বিন্যাস

টাকার পরিমাণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	অর্থের উৎস	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫০	০৪	১৬.৬৭	নিজস্ব উপার্জন	২১	৩৮.০০
৫০-১০০	০৯	৩০.০০	পরিবার থেকে	১১	২০.০০
১০০-২০০	০৮	২৬.৬৭	পারিবারিক চুরি/ জোর পূর্বক	০৭	১২.৭৩
২০০-৪০০	০৬	২০.০০	মূল্যবান দ্রব্যাদি বিক্রয়	০৯	১৬.৩৬
৪০০- তদূর্ধ	০৩	১০.০০	ঋণের মাধ্যমে	০৬	১০.৯১
			ছিনতাই/অসামাজিক কার্যকলাপ	০১	০১.৮২
মোট	৩০	১০০		৫৫	১০০

গড় ব্যয় =১৮৫.৮৩ টাকা

* একাধিক উত্তর গৃহীত

সারণি-৮

৩ বৎসরে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ও বারাকায় ভর্তিকৃত রোগীদের আনুপাতিক হার

প্রতিষ্ঠানের নাম	ভর্তির সন			মোট
	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১১০৮	৯১৪	৫৭০	২৫৯২
বারাকা	৪৬	৫১	৩৬	১৩৩
মোট	১১৫৪(৪২.৩৩)	৯৪৬(৩৫.৪৩)	৬০৬ (২২.২০)	২৭২৫(১০০)

সারণি-৯

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি কেন্দ্র ও বারাকায় ৩ বৎসরের মাদকাসক্তদের বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সেবনের শ্রেণী বিভাগ

মাদকদ্রব্যের নাম	বৎসর			সর্বমোট/শতকরা হার
	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	
হিরোইন	৯৯২(৮৬.০৬)	৮০০(৮২.৮১)	৩৩০(৫৪.৪৬)	২১২২(৭৭.৮৭)
প্যাথেড্রিন	৪৭(৪.০৭)	১৫ (১.৫৫)	৩২(৫.২৮)	৯৪(৩.৪৪)
ফেনসিডিল	২৩(১.৯৯)	৪২(৪.৩৪)	৮৫(১৪.০২)	১৫০(৫.৫০)
পলিড্রাগস	৩৫(৩.০৩০	৪৬(৪.৭৬)	৭৬(১২.৫৪)	১৫৭(৫.৭৬)
এ্যালকোহল	১৩(১.১২০	৯(০.৯৩)	৮(১.৩২)	৩০(১.১০)
গাঁজা	২৫(২.১৬)	২৬(২.৬৯)	৪০(৬.৬০)	৯১(৩.৩৩)
নাইট্রাজম	১৬(১.৩৮)	২৭(২.৭৯)	৩২(৫.২৮)	৭৫(২.৭৫)
অন্যান্য	০২(০.১৭)	১০(০.১০)	০৩(০.৪৯)	০৬(০.২২)
মোট	১১৫৩(৪২.৩১)	৯৬৬(৩৫.৪৪)	৬৯৬(১০০.০০)	২৭২৫(১০০.০০)

সারণি-১০

গ্রাম ও শহর ভিত্তিক উত্তরদাতাদের শতকরা বিন্যাস

মাদকাসক্তদের অবস্থান	বৎসর ওয়ারী			
	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	মোট শতকরা হার
গ্রাম	১০(২১.৭৩)	৪(৭.৮৯)	৬(১৬.৬৭)	২০(১৫.০৪)
শহর	৩৬(৭৮.২৭)	৪৭(৯২.১৬)	৩০(৮৩.৩৩)	১১৩(৮৪.৯৬)
মোট	১০০(৪৬)	৫১(১০০)	৩৬(১০০)	১৩৩(১০০)

* মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এই সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।

তথ্য নির্দেশিকা

১. ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ''ভয়েস অব আমেরিকার এক বিশেষ সেমিনারে তৎকালীন ফাষ্টলেডী ন্যান্সী রিগ্যানের বক্তব্য। দেখুন ''*আপনার জন্য খাবার*', ইউসিস নিউজ বুলিটিন, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ঢাকা-১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৯।

২. U. N. A. B. *UN Against Drug Abuse.* United Nations Association of Bangladesh, Dhaka, 1988 P-3.

৩. আলম, ডঃ আহমদ ফখরুল ''*মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির কতিপয় দিক*'' মাদক বিরোধী সংস্থা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৯।

৪. তালেব, মোঃ আবু ''*মাদকদ্রব্য অপব্যবহার*'' মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বুলেটিন, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯২, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বুলেটিন, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯২, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃষ্ঠা-৬১।

৫. খান, আখতার হামিদ ''*সর্বনাশা নেশা ও আজকের বাংলাদেশ*'' পাক্ষিক পালাবদল, ১৬-৩০ এপ্রিল ১৯৯৩, ২য় বর্ষ, ২২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৩ ও৪।

৬. সাহা, সুবীর কুমার ''*মাদকদ্রব্য সমাজ ও আইন*'' বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২৮।

৭. হক, এম, ইমদাদুল ''*মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার*'' মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বুলেটিন, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ১৯৯২-৯৩, পৃষ্ঠা-৬২।

৮. তালেব, মোঃ আবু ''*মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার*'' মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সংখ্যা ৮২-৯৩, পৃষ্ঠা-৬২।

৯. *The United Nations and Drug Abuse Control 1989.* Department of Public Information in Consultations with the UN Division Narcotic Drugs the International Narcotics Control Board secretarial, P-210.

১০. IBID P-21.

১১. IBID P-23

লোক প্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা, মার্চ ৯৮, চৈত্র ১৪০৪

মহিলা ও শিশুদের অবস্থা পর্যালোচনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮.৫২ ভাগ মহিলা। অপরদিকে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ। এই ৪৫ ভাগের মধ্যে পুরুষ শিশুর হার প্রায় ২৩ভাগ এবং মেয়ে শিশুর হার প্রায় ২২ ভাগ। অর্থাৎ সকল বয়সী মহিলা (মেয়ে শিশুসহ) ও অনুর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সী পুরুষ শিশুর একত্রিত হার প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশের কাছাকাছি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্ভবত আমরা চিন্তা করি খুব কম এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করি তার চেয়েও অনেক কম। মনে হয় যেন দায়সারা গোছের কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ, কিছু আইন প্রণয়ন এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করি। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের অবস্থা ও কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বিষয় আলেচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মহিলাদের চিত্র

বাংলাদেশের মহিলা ও পুরুষের তুলনামূলক অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ (২৮(২) অনুযায়ী রাষ্ট্র এবং গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এদেশের মহিলা সমাজ পশ্চাদপদ, উপেক্ষিত এবং সর্বক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পেশা, আয়, মজুরী প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে।

---

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাংলাদেশে পুরুষ ও মহিলার তুলনামূলক অবস্থানের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক তথ্য পর্যালোচনা করা যেতে পারে, যার দ্বারা মহিলা সমাজ সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব হবে (সারণি ১)।

সারণি-১

বাংলাদেশের পুরুষ ও মহিলার কতিপয় মৌলিক তথ্য

বিষয়	পুরুষ	মহিলা	মোট
শিক্ষার হার	৪২.০০%	২২.০০%	৩২.০০%
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার	৯৪.০০%	৬০০%	১০০.০০%
বেসরকারী শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	৯২.০০	৮.০০	১০০.০০
বেসামরিক শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	৩১.০১	২০.১	৫১.২
সক্রিয় বেসামরিক শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	৩০.৫	১৯.৭	৫০.২
বেকারত্বের হার (আধা-বেকারত্ব ব্যতীত)	২.০%	১.৯%	১.৯%
কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রম শক্তির হার	২.২%	০.২%	২.৪%
স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত (মিলিয়ন)	৬.৭৭	০.৯৭	৭.৭১
গড় আয়ু (বছর)	৫৮.৯	৫৮.০	৫৮.৫

(সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯১)

সারণিতে বর্ণিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের পশ্চাদপদতা লক্ষণীয়। পেশা, কর্মসংস্থান, এমনকি গড় আয়ুর ক্ষেত্রেও মহিলারা যথেষ্ট পিছিয়ে আছেন। কেবল ১টি ক্ষেত্রে তাঁদের পদচারণা পুরুষের চেয়ে বেশী। সেটি হলো বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প। এই শিল্পে বাংলাদেশের প্রায় ৭৫০টি পোশাক তৈরীর কারখানার ৩,৫০,০০০ জন শ্রমিকের শতকরা ৮৫ ভাগই মহিলা (ইউনিসেফ ১৯৯০)।

বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক অবস্থান

জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই একজন বাঙালী নারী প্রায় বন্দীদশায় অবস্থান করে একদিন সবার অলক্ষ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। বাংলাদেশের মোট মহিলা জনসংখ্যা ৫৩.৩ মিলিয়ন; কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রায় সকল কার্যক্রমই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীতে তার প্রথম পদার্পণের দিনটি থেকেই সে অবাঞ্ছিত। জন্মের পর থেকেই একজন মেয়ে তার পরিবারে নানারকম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়, যা বিভিন্ন রূপ ও মাত্রায় তার জীবনভর চলতে থাকে। এ সম্পর্কে Begum (1988) বলেন, "...The birth of a girl child is rerely celebrated by azan which reflects the community's

recognition of a baby's arrival. From early childhood she is made fully conscious of the feeling that unlike her brother who are regarded as assets to the family but she is a liability."

ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে ধৈর্য্য ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হলেও মেয়েদের আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি পরিবারের এক ধরনের নিস্পৃহ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিতেই তাকে পর্দা-প্রথা অনুসরণ করে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আশ্রয় নিতে হয়। ফলে জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে সমাজের সাথে তার সকল যোগাযোগ হয় বিচ্ছিন্ন। এ সম্পর্কে Chowdhyry বলেন, "She may not attend religious gatherings, enter a mosque or attend meeetings or festivals."

ঐতিহ্যগতভাবে একজন মেয়েকে খুব অল্প বয়সেই বিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীদের বয়স তাদের তুলনায় (গড়পড়তা সাত বৎসর) বেশী থাকে। বিয়ে বা স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের তেমন কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশের পিতামাতা, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, পুত্র সন্তান লাভের প্রতি অধিক আগ্রহী এবং পুত্র সন্তান না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে সন্তান জন্মদান করতে থাকেন। তাঁরা পুত্র সন্তানকে বংশ রক্ষা ও তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন। কৈশোর থেকেই একজন মেয়েকে রান্নাবান্না, গৃহকর্ম, ছোট ভাইবোন দেখাশুনা, মোট কথা তাকে একজন ক্ষুদে মায়ের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের প্রতিদিনের কর্মঘন্টা পুরুষদের তুলনায় বেশী হলেও তা আর্থিক মানদন্ডে পরিমাপ করা হয় না এবং তার কোন সামাজিক স্বীকৃতিও নেই। এ প্রসঙ্গে Farooque বলেন, "Women workd much longer hour as productive work than husbands but the time women spend at work is generally unnoticed, because most of it occurs in the kitchen and in expenditure-saving household work."

অর্থনীতিতে উৎপাদনের সার্বিক উপকরণসমূহ পুরুষদের হাতে ও তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে একই পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রাপ্ত সম্পত্তির তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তির মাত্র এক-অষ্টমাংশ পান। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য থাকায় এবং তাঁরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হওয়াতে এই আইন কদাচিৎ অনুসৃত হয়ে থাকে। ফলে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে একজন

মহিলাকে তাঁর পৈতৃক বা স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুগ্রহে গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের মহিলাদের নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার অন্যতম কারণ। যৌতুকের দাবীতে তাঁদেরকে শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত বিবাহ ভেঙ্গে যায়। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা খুললেই যৌতুকের বলি, আত্মহত্যা ও নারী নির্যাতনের করুণ চিত্র চোখে পড়ে।

শিক্ষাগত অবস্থা

শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তাঁদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা তথা উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষার অভাবে মহিলারা পুরুষদের পাশাপাশি তাঁদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মেয়ে শিশুদের মাত্র ৪৮% বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যাদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ড্রপআউটের পরিমাণ৭২%। মহিলাদের শিক্ষার হার বর্তমানে শতকরা ২২ ভাগ (বিবিএস, ১৯৯১)।

মহিলাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা

কোন সমাজের জনগণের পুষ্টি স্বাস্থ্যগত অবস্থা তাঁদের সামাজিক অবস্থান এবং শিক্ষার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষাহীনতা, অপুষ্টি ও রোগগ্রস্ততার মাত্রা দুঃখজনক ভাবে বেশি। এ সম্পর্কে Khan (1987) তাঁর গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "এদেশের মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে যায় এবং মা হয়। গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময়েও তারা প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পুষ্টির কিছুই পায় না। বাঙালী সংসারের সনাতন নিয়মে বাড়ির সবার খাওয়া হলে মেয়েরা অবশিষ্ট খাবার খায়। ফলে তাদের ভাগের খাবার প্রায় সর্বদাই পরিমাণে কম এবং গুণগত মানেও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এদেশের স্বল্পবিত্ত সংসারের গর্ভবতী মায়েদের গড় ওজন সবারই প্রায় ৫০কেজির নীচে। এত ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের মায়েদের সাধারণত গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব, দীর্ঘস্থায়ী প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদি অসুবিধা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে ক্ষীণদেহী মায়েদের শরীর আরও ভেঙ্গে যায়, আয়ু-কমে যায় স্বাভাবিকভাবে।"

এদেশের মহিলাগণ পুরুষদের চেয়ে ২৯% কম ক্যালরী গ্রহণের সুযোগ পান। মহিলাদের গড় ওজন ৫০ কেজি। শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, কম

ওজন প্রভৃতিতে ভোগেন বলে তাঁদের প্রসবকালীন মৃত্যুসহ রোগের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী (ইউনিসেফ, ১৯৯৩)। বাংলাদেশের মহিলারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন নন। তাঁদেরকে এক্ষেত্রে পুরুষদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা ইচ্ছে থাকলেও জন্ম নিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পাননা এবং অধিক সন্তান জন্ম দানে বাধ্য হয়ে অপুষ্টি ও রক্ত শূন্যতায় ভোগেন। আবার অনেকে জন্ম নিরোধক সামগ্রী গ্রহণে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হন এবং বিভিন্ন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হন। পুরুষ সঙ্গীদের তুলনায় মহিলাদের স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের হারও অনেক বেশী। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে সরকার কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিলেও পুষ্টি ব্যবস্থা আজও অবহেলিত রয়ে গেছে।

মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা ও সন্তান জন্মদান

বাংলাদেশে মহিলাদের বিয়ের গড় বয়স ১৮ বছর, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ২৫ বছর। গড়ে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য সাড়ে সাত বছর। যদিও মহিলাদের বিয়ের গড় বয়স ১৮ বছর, কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের গড়ে শতকরা ২০ ভাগ (কিশোরী বধূ) ১৫ বছরে প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। সত্তুরের দশকে সক্ষম মহিলাদের গড় গর্ভ ধারণের হার ছিল ৭.৫, আশির দশকের শেষ ভাগে তা ৪.৯তে নেমে এসেছে, যা এখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উচ্চতর হার। এদেশের বিবাহিতা মহিলাদের শতকরা ১৭ ভাগ তাঁদের ৪০-৪৪ বছর বয়স শ্রেণীতে হয় বিধবা, না হয় তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকেন। শতকরা ৬২ ভাগ গর্ভবতী মহিলা তাঁদের ১ম সন্তান ছেলে কামনা করে থাকেন এবং এতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই সন্তান জন্মদানের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতি বছর প্রায় ২৮,০০০ মহিলা সন্তান প্রসবকালে অথবা সন্তান ধারণজনিত বিভিন্ন অসুখের কারণে মৃত্যু বরণ করে থাকেন। প্রতি ১০০০ জীবন্ত শিশুর ক্ষেত্রে প্রসূতি মাতার মৃত্যুর হার ৪.৭ (বিবিএস, ১৯৯১)। অবশ্য ১৯৯৪ সালে এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৫ এ নেমে এসেছে।

মহিলাদের পেশা, কর্মসংস্থান ও আয়

এদেশে মহিলাদের শিক্ষার হার কম। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদেরও বিশাল অংশ কোন প্রকার চাকরি বা কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নন। কারণ, পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও মহিলাদের স্বাধীন মতামত সর্বদা কার্যকর হয়না। অনেককে আবার শিক্ষিত হয়েও বেকার থাকতে বাধ্য হতে হয়।

এদেশে গৃহকর্ম বা পরিবারের যাবতীয় কার্যাদি (যেমন রান্না-বান্না, গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখা, কাপড় কাঁচা, সন্তান লালন-পালন, সেবা সুশ্রুষা, চাল ও আটা তৈরী, কৃষিকাজে

সহায়তা, সুচিকর্ম, প্রভৃতি) মহিলারাই সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু সেগুলো আর্থিক মূল্যে নিরূপণ করা হয়না। গ্রামাঞ্চলের মহিলারা শাক-সব্জীর চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল ও গবাদি পশু পালন, ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন। এগুলোও আর্থিক উপার্জনে ধরা হয়না। কেবল ব্যবসা বা চাকরি থেকে কৃত উপার্জনকে আয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৮৯সাল থেকে সরকারীভাবে মহিলাদের গৃহকর্ম ও পুরুষের বিভিন্ন কর্মে সহায়তাদানকে বৃহৎ সংজ্ঞায় কর্মশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, শহরাঞ্চলে ২৯% এবং গ্রামাঞ্চলে ৭০% মহিলা সক্রিয় কর্মশক্তির অধীনে গণ্য হচ্ছেন। পুরুষ-প্রধান পরিবারে ২৫-৫০% এবং মহিলা-পদান পরিবারে ৯০% তাঁদের জীবিকার্জনে রত বলে ধরা হয়েছে (ইউনিসেফ, ১৯৯৪)। এদেশে মহিলা শ্রমিকের মজুরী অত্যন্ত অল্প। অকৃষি খাতে তাঁদের মজুরী পুরুষের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ। কৃষি খাতে তাঁরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরীর চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগেরও কম মজুরী পান (আহমেদ, ১৯৮৮)।

মহিলাদের চাকরি ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে বিরূপ এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। চাকরি করলে আর্থিক দিক থেকে কন্যা ও স্ত্রী স্বাবলম্বী হলে পরিবারে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বেড়ে যাবে, এই ভেবে অধিকাংশ পিতা ও স্বামী তাঁদেরকে কর্মে ও চাকরিতে নিরুৎসাহিত করেন। ১৯৭৬ সনের এক নমুনা জরিপে দেখা যায়, ২৭০ জন পুরুষ মত প্রকাশ করেছেন যে, "মহিলাদের কর্মসংস্থান ও গৃহকর্মের সাথে (যেমনঃ সেলাই, খেলনা তৈরি, টিউশনী ইত্যাদি) সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। এরপর স্থান ছিল শিক্ষকতা ও ডাক্তারী পেশাার। তাদের ধারণা ছিল অনুরূপ পেশায় পুরুষ-সাহচর্য কম, ফলে এতে মহিলাদের সতীত্ব রক্ষা পাবে" (হাশমী, ১৯৮৭)। এই যদি হয় মহিলাদের প্রতি শহরের শিক্ষিত লোকের ধারণা, তবে গ্রামের অবস্থা কী তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু আরো দুঃখজনক ঘটন হলো, সমান কাজে মহিলাদের দৈনিক বা মাসিক বেতন কিংবা মজুরী পুরুষদের তুলনায় কম। শিল্প কারখানায় সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ শুধু সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থারই নয়, পেশাগত নিরাপত্তারও পূর্বশর্ত। কর্মজীবী মহিলাদের ৯০ শতাংশ গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত (হাশমী, ১৯৮৭)। জাতীয়করণকৃত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মাত্র ৬% মহিলা। এছাড়া নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম অবসর পান ও বেশি কাজ করেন (হাশমী, ১৯৮৭)। দারিদ্র, নদী ভাঙ্গন, উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি প্রভৃতি কারণে ইদানীং পোশাক শিল্পে মহিলারা অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানের মত সেখানেও তাঁরা নিদারুণভাবে শ্রমশোষণের শিকার। এমনকি সেখানে তাঁদেরকে লিখিতভাবে কোন নিয়োগপত্র পর্যন্ত দেয়া হয় না। এক জরিপে দেখা যায়, যেখানে ৬ শতাংশ পুরুষ কাজের পরিবেশ সম্পর্কে

অভিযোগ এনেছে, সেখানে মহিলা অভিযোগকারীর সংখ্যা ৪৯% (ILO, 1993)।

অন্যদিকে শিক্ষিতা মহিলাদের চাকরির পরিসরও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। যেমন ঃ ব্যক্তিগত সচিব, অভ্যর্থনাকারিণী, বিমানবালা, নার্স ইত্যাদি, যা সমাজের অনেক পুরুষ ভাল চোখে দেখেন না। সাধারণভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও মহিলাদের তেমন কোন কর্তৃত্ব নেই।

আত্ম-কর্মসংস্থানে মহিলা

বিবিএস (১৯৯৫) কর্তৃক আত্ম-কর্মসংস্থান (Self Employment) এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে, "A self employment or own account work is, a person who operates enterprise or business on his own account or operates it jointly with others in form of partnership. A self employed person may or may not hire workers to assist him in his enterprise".

বাংলাদেশের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ২২% আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। সংখ্যার দিক থেকে তা ৭৭,১২,০০০; যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৭,৭২,০০০ এবং মহিলার সংখ্যা ৯,৪০,০০০। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে শহুরে মহিলাদের তুলনায় গ্রামীণ মহিলারা প্রায় ৬৭ গুণ বেশী আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন (বিবিএস, ১৯৯০)।

বয়সের বিন্যাসে দেখা যায়, উপরে বর্ণিত ৯,৪০,০০০ আত্ম-কর্মসংস্থানে রত মহিলার মধ্যে ১৫-৩৯ বছর বয়স্ক ৭,৫৯,০০০, ৪০-৪৫ এ বয়সসীমায় ৭৪ হাজার এবং ৪৫-৭০ বয়স সীমায় ১,০৬,০০০জন। তাঁদের সবাই গড়ে ১৩.৭ ঘন্টা/সপ্তাহে আত্ম-কর্মসংস্থানের কাজে ব্যয় করেন (বিবিএস, ১৯৯৫)।

সারণি ঃ ২

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা

প্রতিবন্ধকতাসমূহ	শতকরা হার
সুযোগের অভাব	৪০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা এবং ধ্যান ধারণা	২৮
সাংসারিক দায়িত্ব	১৬
অসুস্থতা	১৬
মোট	১০০

(সূত্র ঃ সিরডাপ, ১৯৯৩)

রাজনীতিতে মহিলাদের অবস্থান

যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ের মধ্যে নারীদের এই অধঃস্তনতা ও প্রান্তিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অপরাপর অভিব্যক্তি, যেমন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেও একই অবস্থা পরিদৃষ্ট। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মহিলা সম্পাদিকার পদটি বাদে প্রায় প্রতিটি দলের সম্পূর্ণ কমিটিই পুরুষদের দখলে। আশির দশক থেকে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয় সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দু'জন মহিলা যথাক্রমে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বি,এন,পির'র সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সরকার প্রধান ও সংসদের বিরোধীদলের নেতা যথাক্রমে উক্ত দু'জন মহিলা, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিফলন নয়। বাংলাদেশের ৪টি বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাহী কমিটিসমূহে মহিলাদের অবস্থান সারণী ৩ এ দেখানো হলো।

সারণি- ৩

বাংলাদেশের ৪টি বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাহী কমিটি সমূহে মহিলাদের অবস্থান

দল		সদস্য	সদস্য
বি. এন. পি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্য নির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে	মজলিস-ই-শূরা	১৪১	–
ইসলাম	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/ মজলিস-ই-আমেলা	২৪	–

(উৎস ঃ রাজনৈতিক দলের অফিস সমূহ থেকে সংগ্রহ, ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।)

নির্বাচনী আচরণের ওপর আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, শহরের অভিজাত এলাকার নারীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৮জন এবং গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের শতকরা ৩৪ জন নারী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু শহরের অভিজাত এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী পরিবারের যেসব নারী নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬৬ জন নারী সচেতন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেন। বাকী ৩৪ জন ভোট দেন আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের ইচ্ছায়। এর পাশাপাশি শহরের বস্তি ও গ্রামীণ নিম্নবিত্তদের মধ্যেকার শতকরা ১২ জন নারী নিজের ইচ্ছায় বা বিবেচনায় ভোট দেন। সমাজের এই স্তর থেকে শতকরা ৮৮ জন ভোট প্রদান করেন স্বামী বা পিতার ইচ্ছা ও নির্দেশে (হক, ১৯৮৭)।

নারী নির্যাতন, দেহজীবিকা ও নারী পাচার

ব্যাপক গণদারিদ্র, ক্ষুধা, নির্যাতন, সমাজচ্যুতি প্রভৃতি কারণে অনেক মেয়ে পতিতাবৃত্তিতে নামছে। তাছাড়া দালাল ও অসৎ লোকের খপ্পরে পড়েও অনেক দরিদ্র গ্রাম্য মহিলা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। খান ও আরেফিন (১৯৮৮) ঢাকা শহরের নটীনগর ও নারায়নগঞ্জের আনন্দবাজার পতিতালয়ের পতিতাদের ওপর যে জরিপ করেন, তাতে দেখা যায় ঃ এ দু'টি পতিতা পল্লীতে মোট পতিতার সংখ্যা প্রায় ৪০০০ যাদের শতকরা ৭৫ ভাগের বয়স ১৫-৩০ বছরের মধ্যে। উক্ত জরিপ থেকে আরো দেখা যায়, এসব পতিতার আয়ের একটা বিরাট অংশ দালাল, সর্দারনী ও অনুমোদনপত্র প্রদানে সহায়তাকারী মাস্তানরা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ, নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে। গত আশির দশক থেকে সরকার মহিলাদেরকে গৃহকর্মের পাশাপাশি আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দ্রুত ও সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারী পর্যায়ে নারী উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। সত্তুর দশকের শেষ ভাগে সরকার নারী উন্নয়নের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। সে আমলে মহিলা সম্পর্কিত নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ নগণ্য।

সরকারী পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগ

১৯৭১ সাল হতে এ পর্যন্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে সরকার যে সমস্ত সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- উইমেন রিহেবিলিটেশন বোর্ড গঠন-১৯৭১
- বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সম উন্নয়নের নির্দেশ-১৯৭২
- উইমেন রিহেবিলিটেশন ও ফাউন্ডেশন গঠন-১৯৭৪
- জাতীয় মহিলা সংস্থা সৃষ্টি- ১৯৭৬
- মহিলা বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি-১৯৭৬
- মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি-১৯৭৮
- যৌতুক প্রথা রহিতকরণ আইন-১৯৮০
- সরকারী ও আধা-সরকারী সকল ক্যাডারে মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ (কোটা ১০%)-১৯৮২
- সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ (১৫%)-১৯৮৩
- নারী নির্যাতন নিরোধ অধ্যাদেশ-১৯৮৩
- মহিলা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ পরিদপ্তর-১৯৮৪
- বাল্যবিবাহ নিরোধ সংশোধিত অধ্যাদেশ-১৯৮৪
- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-১৯৮৫

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে মহিলাদের উন্নয়নের খাত থাকলেও কার্যত তা এখনও সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিকীগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে সেগুলোর বাস্তবায়নে রয়েছে অনেক প্রভেদ, দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি। যথা ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নের কথা থাকলেও তা লিঙ্গীয় ভিত্তিতে (Gender Basis) করা হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে দারিদ্র দূরীকরণে নারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ ছিল। এছাড়া পুঁজি-ঘন শ্রমশক্তির পরিবর্তে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়া সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য সঠিক টেকনোলজির অভাবে অভিজ্ঞ মহিলাদের কাজে লাগাতে পারেনি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষভাবে তাঁদের উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু কার্যত এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য আসেনি এবং লিঙ্গীয় বৈষম্যও দূর করা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র দুরীকরণে মহিলাদের দক্ষতাবৃদ্ধি, টেকনিক্যাল জ্ঞান বিতরণ ও কর্মে নিয়োগের জন্য তাঁদেরকে আরো সুযোগ দিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে মহিলাদের ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- উন্নয়ন কর্মকান্ডের সর্বস্তরে নারীদের সম্পৃক্তকরণ
- নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও ড্রপআউট রোধকরণ
- কৃষি, শিল্প, চাকরি,ব্যবসায় নারীদের সুযোগ সম্প্রসারিতকরণ
- শিল্প উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে আনার জন্য নারীদের স্বনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার এবং সেজন্য তাঁদের ঋণদানের সুযোগ প্রদান
- চাকরি ক্ষেত্রে নারীদের কাজের পরিবেশের উন্নয়ন এবং নারীদের মজুরী/ বেতনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণ
- সর্বগ্রাসী দরিদ্র পরিবেশ থেকে নারীদের রক্ষাকরণ
- দারিদ্রের চক্রে আবদ্ধ স্বাস্থ্যহীন মহিলাদের স্বাস্থ্য যত্নের ওপর জোর প্রদান
- প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের উপকারের সাথে তাঁদের লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান
- নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের তফাৎ দূরীকরণ

গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নে কার্যরত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা

বাংলাদেশে মহিলাদের কল্যাণ সাধন ও উন্নয়নে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বর্তমানে কার্যরত রয়েছে। বাংলাদেশের ৩০০টি থানায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর রয়েছে। এছাড়া সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড প্রধানত গ্রামীণ মহিলাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে ঋণ প্রদানসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা) এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া) মহিলাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, প্রবর্তনা, সপ্তগ্রাম নারী সংঘ, কারিতাস প্রভৃতি সংস্থা ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। এসব কার্যক্রমের শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামীণ এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে। শহরে কেবল বস্তি এলাকায় বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম চালু আছে। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের 'শহর সমাজ সেবা কর্মসূচি' এবং মহিলা অধিপ্তরের কিছু কর্মসূচি ছাড়া তেমন কোন সরকারী কার্যক্রম শহর এলাকায় চালু নেই।

বাংলাদেশের শিশু

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ ০-১৪ বছর বয়সী শিশু। এদের অধিকাংশ অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা ও নানা রোগের শিকারে পরিণত হয়। মহিলা শিশুর অবস্থা পুরুষ শিশুর তুলনায় অধিকতর খারাপ। কেবল পুরুষদের কাছেই নয়, মহিলাদের কাছেও মহিলা শিশুগণ উপেক্ষিতা হয়ে থাকে।" পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের পিছনে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর রয়েছে। শৈশবে মেয়ে শিশুরা পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হলেও (কারণ তারা গৃহস্থালীর কাজ করে) পুরুষ শিশুরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের জন্য আর্থিক কার্যকর বা উৎপাদনশীল বলে গণ্য হয়। আর মেয়েরা যে কাজ করে তা অস্পষ্ট বা সে কাজ সরাসরি কোন অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে প্রতীয়মান হয় না" (Mannan, ১৯৮৮)।

পুরুষ শিশু বনাম মহিলা শিশু ঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও শিক্ষা

বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ মহিলা তাঁর পরবর্তী সন্তানকে মেয়ে শিশু হিসেবে কামনা করেন (ইউনিসেফ, ১৯৯৩)। এক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে যে ধারণা কাজ করে তা হলো, পুরুষ শিশু বড় হয়ে তাঁকে রোজগার করে খাওয়াবে, বৃদ্ধকালে আশ্রয় দেবে। কিন্তু মহিলা শিশু বড় হলে অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম তো হবেই না, উপরন্ত তাকে বিয়ে দিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হবে। এক কথায়, মহিলা শিশুকে এ সমাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্ম বা উপার্জনের সহায়ক বিবেচনা না করে তাকে ঝামেলা বা বোঝা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে পুরুষ শিশুর তুলনায় মহিলা শিশুর আদর যত্ন, পুষ্টিকর খাবার, চিকিৎসা সুযোগ ইত্যাদি কম প্রাপ্তি ঘটে এবং কম ক্যালরী গ্রহণের সুযোগ পায়। অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মহিলা শিশুরা পুরুষ শিশুদের তুলনায় ১৬% ক্যালরী কম গ্রহণের সুযোগ পায় (ইউনিসেফ, ১৯৯৩)। এই বয়সী মহিলা শিশুর মৃত্যুর হার পুরুষ শিশুর তুলনায় ২৭% বেশী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলা শিশু উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম পেয়ে থাকে। যদিও বাংলাদেশে মোট স্কুল গমনযোগ্য শিশুদের ৭৭% স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে মহিলা শিশুর ভর্তির হার ৫০%। ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুদের ২৩% এবং মহিলা শিশুদের ১০% মাত্র স্কুল গমনে রত থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলা শিশুর কলেজ গমন অনুপাত ৬০ ঃ ৪০ জন। পুরুষ শিশুদের তুলনায় মহিলা শিশুদের পথে ঘাটে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতকরণ এবং অপহরণ ও পাচারকরণের ঘটনাও এদেশে অনেক বেশী।

প্রতিটি শিক্ষার স্তরেই মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় পশ্চাদপদ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার যথাক্রমে ৪৫%, ৩৫% ও ২৮%।

শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে তাদের ড্রপ আউটের পরিমাণও বেশি। তাছাড়া প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মেয়ে শিশু পরবর্তী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাবে নিরক্ষরতায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মক্তব, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদালয়সমূহেও মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য (সারণি ৪)।

সারণি ঃ ৪

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী-পুরুষের তুলনামুলক অবস্থান

শিক্ষার স্তর	নারী	পুরুষ
প্রাথমিক	৪৫%	৫৫%
মাধ্যমিক	৩৫%	৬৫%
উচ্চ মাধ্যমিক	২৮%	৭২%
বিশ্ববিদ্যালয়	২০%	৮০%
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপ আউটের হার		
১ম শ্রেণী	২০.১%	১৮.১%
২য় শ্রেণী	১২.৭%	১৯.৪%
৩য় শ্রেণী	১৫.২%	১৫.৯%
৪র্থ শ্রেণী	১২.৩%	১৭.৯%
৫ম শ্রেণী	১১.৩%	১০.৮%

(সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯২)

শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রোগাক্রান্ততা

১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩৬ লক্ষ শিশু জন্ম নেয়, যাদের মধ্যে জন্মের প্রথম মাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্বমোট প্রায় ৪ লক্ষ শিশু ২ বছরের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় এবং সর্বমোট ৭ লক্ষ শিশু অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সেই মারা যায় (Ahmed, 1995)। এরূপ উচ্চ হারে মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই নানা প্রকার অসুস্থতা দেখা যায়। আর

অসুস্থতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো হচ্ছে মায়েদের অপুষ্টি, অশিক্ষা, মৌলিক স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব, প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব প্রভৃতি, এবং এগুলোর মূল শেকড় নিহিত রয়েছে দারিদ্র ও অপর্যাপ্ত মানব উন্নয়নের মাঝে। অবশ্য আশার কথা এই যে, ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯৩ সালে অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১১৬ জনের স্থলে ৮৯ জনে হ্রাস পেয়েছে, কারণ এ সময়ে ইপিআই কর্মসূচি শতকরা ২ ভাগ থেকে শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে (ইউনিসেফ, ১৯৯৫)। সারণি ৫ এ বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচির তথ্য তুলে ধরা হলো। বিশাল হারে এদেশে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মারা যায়। এসব মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো (সারণি ৬)।

সারণি ঃ ৫

গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অনুর্ধ্ব ২ বছর বয়স্ক শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য টীকা ও ইনজেকশন প্রদান কর্মসূচির সফলতা, ১৯৯৫ (শতকরা হারে)

টীকা/ইনজেকশন	দাগ/ডোজ	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ডিপিটি ও পোলিও	১ম	৮৩.৪	৮০.০	৮১.৮	৮৭.৫	৮৫.৫	৮৬.৭
	২য়	৭৭.২	৭৫.২	৭৬.২	৯১.২	৮৫.৯	৮৮.৮
	৩য়	৭৪.৪	৭৩.০	৭৩.৯	৮৩.৬	৭৮.৭	৮১.৪
হাম	-	৭৩.২	৭০.২	৭২.৩	৭৮.৭	৭৩.৯	৭৬.৫
বিসিজি	–	৭৩.৬	৬৮.৯	৬৯.১	৭৮.১	৭৫.০	৭৬.৭
ধনুষ্টংকার ইনজেকশান (শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের)	১ম	৭০.৭	৭৩.০	৭১.৮	৭৩.৩	৭৬.৩	৭৪.৫
	২য়	৫১.৮	৫৪.৮	৫৩.৩	৬৩.৩	৬২.১	৬২.৬

(সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯৫)

সারণি ঃ ৬

অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর কারণ ও শতকরা হার

কারণ	শহকরা হার
অপুষ্টি	১৭.০০
ডায়রিয়া	১৩.০০
হুপিং কাশি	২.০০
অপূর্ণ জন্ম/স্বল্প জন্ম ওজন	১১.০০
ধনুষ্টংকার	৮.০০
অন্যান্য তীব্র শ্বাস সংক্রমণ	১৮.০০
হাম	৭.০০
অন্যন্য অসুখ	২৪.০০
মোট	১০০.০০

(সূত্র ঃ Planning Commission : Reaching the People, 1993)

অনূর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শিশুদের অপুষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পুষ্টিজনিত জরীপ, ১৯৯২ এর তথ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। সারণি ৭ এ গোমেজ শ্রেণীকরণ দ্বারা বিষয়টি উপস্থাপিত হলো ঃ

সারণি ঃ ৭

অনূর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির বিদ্যমানতা

(গোমেজ শ্রেণীকরণ)

অপুষ্টির অবস্থা	শিশুদের শতকরা ভাগ		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ	৬.২	৬.২	৬.২
নিম্ন (১ম ডিগ্রী)	৪০.৬	৩৮.৯	৩৯.৮
মাঝারি (২য় ডিগ্রী)	৪৬.৯	৪৭.৪	৪৭.২
তীব্র (৩য় ডিগ্রী)	৬.৩	৭.৪	৬.৮
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

(সূত্র ঃ BBS, 1992)

উপরি-উক্ত সারণির তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, মাঝারি ও তীব্র অপুষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুর তুলনায় মহিলা শিশুরা বেশী ভুক্তভোগী।

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচি (ইপিআই) কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, যার ফলে শিশুদের মারাত্মক ৬টি রোগ, (যথা হাম, যক্ষা, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি ও তীব্র স্বাস কষ্টজনিত রোগ) থেকে বর্তমানে এদেশের শিশুরা মুক্তি লাভ করছে। লক্ষ্যণীয় যে, এক্ষেত্রেও পুরুষ শিশুর টীকা গ্রহণের হার মহিলা শিশুর চেয়ে বেশী (সারণি ৫)।

শিশু শ্রম

বাংলাদেশে ১০ বছরের উর্ধ্ববয়সীদেরকে শ্রমশক্তির আওতায় সাধারণত গণ্য করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর চেয়ে কম বয়সী অর্থাৎ ৫ বছর বয়স থেকেই শিশুরা বিভিন্ন শ্রম প্রদানে নিযুক্ত হয়। অবশ্য এসব শিশুর শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়না। তবু যে কোন শিল্প কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং কৃষিকাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে এরা শ্রম প্রদান করে থাকে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট বেসামরিক কর্মশক্তি (১০ বছর ও তদূর্ধ্ব) সংখ্যায় ৫,০৭,৪৪,০০০। এর মধ্যে ১০-১৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৪১,০৭,০০০, যা মোট কর্মশক্তির ৮.১%। কিন্তু এই সংখ্যা যদি ৫-১৪ বছরে হিসেব করা যায়, তাহলে সংখ্যায় তা হবে ১,০৯,২৭,০০০, যা মোট কর্মশক্তির ২১.৫%। এই বয়সী কর্মশক্তির মধ্যে মহিলা শিশুদের সংখ্যা বেশী এবং তা গ্রামীণ ও শহুরে উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষ শিশুর তুলনায় বেশী। সারণি ৮ এ সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হলো।

সারণি ঃ ৮

বেসামরিক শ্রমশক্তি ও শিশু শ্রম, ১৯৮৯

(সংখ্যা হাজারে)

মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি			শিশু শ্রম					
			৫-১৪ বছর		৫-৯ বছর		১০-১৪ বছর	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সর্বমোট	৫০৭৪৪	১০০.০	১০৯২৭	২১.৫	৬৮২০	১৩.৪	৪১০৭	৮.১
পুরুষ	২৯৭৫৯	১০০.০	৫৯৯০	২০.১	৩৫৪৮	১১.৯	২৪৪২	০.২
মহিলা	২০৯৮৫	১০০.০	৪৯৩৮	২৩.৫	৩২৭৩	১৫.৬	১৬৬৫	৭.৯
গ্রামীণ								
সর্বমোট	৪৫০৬২	১০০.০	৯৯৯১	২২.২	৬১৯১	১৩.৭	৩৮০০	৮.৪
পুরুষ	২৫৫৬৫	১০০.০	৫৪৯৮	২১.৫	৩২৪৫	১২.৭	২২৫৩	৮.৮
মহিলা	১৯৪৯৬	১০০.০	৪৪৯১	২৩.০	২৯৪৫	১৫.১	১৫৪৬	৭.৯
শহুরে								
সর্বমোট	৫৬৮২	১০০.০	৯৩৬	১৬.৫	৬২৯	১১.১	৩০৭	৫.৪
পুরুষ	৪১৯৩	১০০.০	৪৯০	১১.৭	৩০২	৭.২	১৮৮	৪.৫
মহিলা	১৪৮৯	১০০.০	৪৪৬	৩০.০	৩২৮	২২.০	১১৮	৭,৯

* ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব

(সুত্র ঃ বিবিএস, ১৯৮৯)

বাংলাদেশে বিদ্যমান শিশু সংক্রান্ত আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৩) এ বর্ণিত যে, "নারী বা শিশুর অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবেনা।" এছাড়া সংবিধানের অপর কয়েকটি অনুচ্ছেদে শিশু সংক্রান্ত বিধান সংযুক্ত। ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে এতিমদের অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভ নিশ্চিত করা। ১৭ অনুচ্ছেদে বলা

হয়েছে, রাষ্ট্র সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব বলে গণ্য করবে।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরদাতা রাষ্ট্র। শিশু অধিকার সনদে ১টি প্রস্তাবনা, ৩টি ভাগ এবং ৫৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। শিশু অধিকার সনদ বিশ্লেষণ করলে প্রধানত ৪ প্রকারের অধিকার বলবৎকরণের বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলো হলো ঃ

ক) শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার

খ) ক্ষতিকর পরিবেশ ও শোষণ থেকে রক্ষা পাবার অধিকার

গ) মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার

ঘ) শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার

বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি আইন, এ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্স শিশু অধিকার সংরক্ষণে বলবৎ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন/এ্যাক্টসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১। দি পেনাল কোড, ১৮৬০ (শিশুদের সম্মতি, অপহরণ সংক্রান্ত)

২। দি ডিভোর্স এ্যাক্ট, ১৮৬৯ (শিশু সন্তানের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা ব্যয় সংক্রান্ত)

৩। দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮

৪। দি মাইন্স এ্যাক্ট, ১৯২৩

৫। দি চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট এ্যাক্ট, ১৯২৯

৬। দি সাপ্রেশান অব ইম্মোরাল ট্রাফিক এ্যাক্ট, ১৯৩৩

৭। দি চিলড্রেন (প্লাজিং অব লেবার) এ্যাক্ট, ১৯৩৩

৮। দি এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন এ্যাক্ট, ১৯৩৮

৯। দি ম্যাটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট, ১৯২৯

১০। দি মিনিমাম ওয়েজেস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১

১১। দি শপস্ এ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৬৫

১২। দি ফ্যাক্টরিজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫

১৩। দি চিলড্রেন এ্যাক্ট, ১৯৭৪

১৪। ইউনিভার্সাল সল্ট আয়োডাইজেশন লেজিসলেশান এ্যাক্ট, ১৯৮৯ (আয়োডিনের অভাব দূরীকরণ সংক্রান্ত)

১৫। প্রাইমারী এডুকেশন (কম্পালসারি) এ্যাক্ট, ১৯৯০

১৬। ব্রেষ্ট মিল্ক সাবসৃটিটিউটস (রেগুলেশান অব মার্কেটিং) অর্ডিন্যান্স-১৯৯২

বিপন্ন শিশু

১৯৯০ সালে শিশুদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন (World Summit for Children) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিপন্ন শিশু বা Vulnerable Children শ্রেণীকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং নিম্নোক্ত ৭ প্রকারের শিশুকে বিপন্ন শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ঃ

১। পথশিশু

২। কর্মজীবী শিশু

৩। শিশু-পতিতা

৪। অপব্যবহার ও অবহেলার শিকার মাতৃপিতৃহীন পরিত্যক্ত শিশু

৫। প্রতিবন্ধী শিশু (শারীরিক ও মানসিক)

৬। সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশু

৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার শিশু

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশু ব্যতীত সকল প্রকার বিপন্ন শিশুর সংখ্যা পর্যাপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশে এদের প্রকৃত সংখ্যা আজও গণনা করা হয়নি। কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে একটি হিসেব পাওয়া যায়। তা হলো ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ শিশু প্রতিবন্ধী। এদের মধ্যে ৪২% দৃষ্টি সংক্রান্ত, ২৬% শ্রবণ সংক্রান্ত, ১৮% শারীরিক পঙ্গুত্ব সংক্রান্ত এবং ১৪% মানসিক প্রতিবন্ধী (সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রিপোর্ট, ১৯৯২)।

শিশুদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারে গৃহীত কার্যক্রম

ক) বাংলাদেশ সরকার শিশুদের (৬-১০) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯১ ও ৯২ সাল থেকে সারাদেশে চালু করেছে।

খ) ফুড ফর এডুকেশন নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা প্রতিটি থানার ১টি করে ইউনিয়ন হিসেবে মোট ৪৬০টি ইউনিয়নে কার্যকর রয়েছে। এতে দুঃস্থ

পরিবারের ৬-১০ বছর বয়স্ক ১জন শিশুর জন্য মাসে ১৫ কেজি এবং ২ বা ততোধিক শিশুর জন্য মোট ২০কেজি গম প্রদান করা হচ্ছে।

গ) মেয়ে শিশুদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং অষ্টম-দশম শ্রেণীর মেয়ে শিশুদের জন্য শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশের মোট ৭০টি এতিম খানায় মোট ৯,২০০ শিশুকে (৫-৯ বছর বয়সী) শিক্ষা, ভকেশনাল ট্রেনিং, পুনর্বাসন, প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে শিশু সদন (ইউনিসেফ রিপোর্ট, ১৯৯৫)। কিছু শিশু সদনকে বর্তমানে 'শিশু পল্লী' তে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যার সংখ্যা বর্তমানে ২৩টি করা হয়েছে (ইউনিসেফ, ১৯৯৫)।

ঙ) সরকার শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগ (হাম, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, তীব্র শ্বাস কষ্ট, যক্ষা, পোলিও) প্রতিরোধের জন্য বিনামূল্যে সারাদেশে ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টীকা ও ইনজেকশান দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে পরিত্যক্ত ও পঙ্গু শিশুদের চিকিৎসা বাবদ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ১৯৯৩-৯৪)।

বেসরকারী উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশে কতিপয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) শিশুদের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নে কার্যরত আছে। এদের মধ্যে ব্র্যাক নন-ফরমাল এডুকেশন এর মাধ্যমে সারাদেশে ৩০,০০০ বিদ্যালয়ে অনূর্ধ্ব ১০ বছর বয়সী শিশুদেরকে (প্রতি বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিশু) শিক্ষা প্রদান করছে (ব্র্যাক, ১৯৯৩)।

'ইউসেপ' নামক অপর একটি এনজিও সারাদেশের ২২টি সাধারণ ও ৩টি কারিগরী স্কুলে তাদের কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষা অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রদান করছে, যেখানে মোট ১২,০০০ শ্রমজীবী শিশু শিক্ষা/প্রশিক্ষণরত আছে (ইউসেপ, ১৯৯৫)।

'সেফ দি চিলড্রেন' নামে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা কর্তৃক পরিচালিত তিনটি প্রতিষ্ঠান এদেশে শিশুদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে বহুপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

'ইউনিসেফ' এর বাংলাদেশ দপ্তর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ইপিআই কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া, আরও অনেকগুলো বেসরকারী দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এদেশে শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমে রত আছে। এগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের জন্য 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে মহিলা ও শিশু (০-১৪ বছর) এর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক। কিন্তু এই দু'টি জনগোষ্ঠী এখনও যথেষ্ট উপেক্ষিত, অনগ্রসর এবং পশ্চাদপদ শ্রেণী। এদেশে মহিলারা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীও বটে। এদের বেশীর ভাগের প্রধান পেশা গৃহকর্ম। গৃহকর্মের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু আর্থিক মূল্যে তাদের শ্রম নিরূপিত হয়না। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে তারা পুরুষের প্রায় অর্ধেক। পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন নন। মহিলা প্রধান পরিবারে এদেরকে সংসার পরিচালনার যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি,ক্যালরী গ্রহণের ক্ষেত্রে এঁরা কম সুবিধা প্রাপ্ত। বাংলাদেশে এঁদের জন্য যথেষ্ট আইন থাকলেও তার বাস্তবায়ন খুবই কম। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় পুরুষকেন্দ্রিকতা, সামাজিক রীতি-নীতি লোকাচার, ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে এরা এখনও প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশে ০-১৪ বছর বয়স্ক শিশুর হার শতকরা ৪৫ভাগ। এদের মধ্যে পুরুষ শিশুগণ মহিলা শিশুদের তুলনায় বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত ও অগ্রসর শ্রেণী। সামাজিকভাবে মহিলা শিশুর জন্ম এখনও আকাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মহিলাদের অবৈতনিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, মহিলাদের অষ্টম-দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে উপ-বৃত্তি প্রদানের ফলে মহিলা শিশুদের শিক্ষার হার অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের জন্য এদেশে বহু আইন বিদ্যমান থাকলেও এরা এদের অধিকারসমূহ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরদাতা রাষ্ট্র। বর্তমানে শিশুদের কল্যাণে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কার্যক্রমের মধ্যে ইপিআই কর্মসূচি, আয়োডিন লবণ ব্যবহার, এতিমদের জন্য শিশু সদন, বিপন্ন ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সার্বিকভাবে এখন পর্যন্ত গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম মহিলা ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

তথ্য নির্দেশিকা

আহমেদ আবদাল, (১৯৮৮), *বিভিন্ন পেশায় নারী,* শিশু দিগন্ত জার্নাল, ঢাকা ঃ ইউনিসেফ।

ইউসেপ, (১৯৯৫), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯০), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯৩), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯৪), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯৫), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

খান, জারিনা রহমান ও আরোফিন, হেলাল উদ্দিন, (১৯৯২), *পতিতা নারী,* ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭২), *বাংলাদেশের সংবিধান-১৯৭২,* ঢাকা ঃ বাংলাদেশ সরকারী প্রেস।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৮৯), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯০), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯২), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯৫), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯২), *পুষ্টিজনিত জরীপ,* ঢাকা।

ব্র্যাক, (১৯৯৩), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, (১৯৯৫), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

সমাজ সেবা অধিদপ্তর, (১৯৯২), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

সিরডাপ, (১৯৯৩), *পরিবীক্ষণ, সমন্বয় এবং দারিদ্র ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* ঢাকা।

হক এ. কে. ফজলুল, (১৯৮৮), *সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশের নারী।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৭ ঢাকা।

হাশমী, সৈয়দ, (১৯৮৭), *পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশে নারী শোষণ ঃ একটি ধারণাগত রূপরেখা,* ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

Ahmed, Nasiruddin (ed.) (1995), *Training Module on Child and Women Development*, Published in BPATC with Collaboration of UNICEF. Dhaka : BPATC.

Bangladesh Bureau of Statistics, (1992), *Report of the Child Nutritional status survey*. Dhaka.

Begum, Nazmeer Noor, (1988), *Pay or Purdah*. Newzealand : Massey University Press Ltd.

Chowdhury, Rafiqul Huda, (1991), *Female Status in Bangladesh*. Dhaka : University Press Ltd.

Farooque, Abdullah, (1987), *Women in Bangladesh : A Disadvantaged Group*, Dhaka : Agami Prokashoni.

ILO, (1993), *Working Condition and Women in Bangladesh*. Dhaka.

Khan, Salma, (1987), *The Fifty Percent*. Dhaka : University Press Ltd.

Mannan, Abdul, (1988), *Sexual Division of Labour and son Preference in Rural Bangladesh*. India : Hindustan Publishing Corporation.

Ministry of Planning, GOB, (1993), *Reaching the People*. Dhaka

Ministry of Planning, GOB, (1992), *Achieving the Goals for Children and Development for the 1990s*. Dhaka : Bangladesh Press.

World Bank, (1990), *Annual Report*. Dhaka.

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

ভূমিকা

গত মে'৯৭ এ দাখিলকৃত স্থানীয় সরকার কমিশন এর প্রতিবেদনে এদেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন ও যথাযথভাবে বিকশিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশমালার আলোকে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই গ্রাম পরিষদ আইন পাশ করেছেন, গ্রাম পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। অপরদিকে সরকার থানা পরিষদ (পূর্বতন উপজেলা পরিষদ) নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির সক্রিয়তা ও কার্যকারিতা আনয়নের জন্য অবিলম্বে আইন পাশ করার জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। ফলে এদেশে মোট ৪ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল হবে। তবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদ হলো এদেশের পরীক্ষীত সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার নামের কিছু ব্যাত্যয় বা পরিবর্তন হলেও সময়ের পরিবর্তনের ধারায় দীর্ঘদিনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার কোন বিলোপন বা স্থগিতকরণ ব্যতীতই বর্তমানের কাঠামোগত বিকাশ ঘটেছে। এদেশে জেলা পরিষদ নামক অন্যতম পুরাতন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি তার বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েক বার হোঁচট খেয়েছে, হয়েছে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত। উপজেলা পরিষদ নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন সফলভাবে যাত্রা করে বড় ধরনের একটি হোচট খেয়ে জীবন-মরন সমস্যায়

---

* থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, পলাশ থানা, নরসিংদী।

ধরনের একটি হোচট খেয়ে জীবন-মরন সমস্যায় পতিত হয়ে রয়েছে। "গ্রাম সরকার" নামক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তার যাত্রা পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার কথা সবারই জানা আছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার উপরে সরাসরি আক্রমণ করা হয়নি বা করা সম্ভব হয়নি, বরং এ প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের যে রূপ বা কাঠামো আমরা দেখতে পাই তা দীর্ঘদিনের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে।

পটভূমি

প্রাচীনকালে এদেশে বর্ণ বা গোত্র ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে গ্রামীণ সমাজের বিকাশের সাথে সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয় বলে ইতিহাস বিশ্লেষণে জানা যায়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের গোলমাল মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে বিশেষত মুঘল শাসকদের আগমনের পরে নতুন নতুন ধরনের এবং সুসংবদ্ধ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুঘলরা 'সুবা' ও 'সরকার' এই দুই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। 'সুবা'র পরিচালককে সুবাদার এবং 'সরকারে'র পরিচালককে শিকদার বলা হতো। আর তারা প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগনা হিসাবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরগনার সুসংবদ্ধ শাসনকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী ও মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম প্রধান ও চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। মুঘল শাসনামলে গ্রামীণ প্রশাসনের পাশাপাশি কতোয়াল নিয়োগ করার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কার্যাদি এবং প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা হতো। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন। এদিকে একজন কাজী বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হতেন। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য প্রতিটি শহের খানকাহ এর ব্যবস্থা ছিল।

এদেশে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার আধুনিক কাঠামোগত ভিত্তির বিকাশ ঘটেছে মূলত বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পরে। বৃটিশরা এদেশে আগমনের পরে ১৭৯০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে। ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনার পূর্বে পরিষদের আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রয়োজন। নিম্নের ছকে পরিষদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আইন/অধ্যাদেশ, গঠন কাঠামো, মেয়াদকাল এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখানো হলো।

ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন/আদেশ/অর্ডিন্যান্স

পর্যায়	আইন/অধ্যাদেশ আদেশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের নাম	গঠন কাঠামো	মেয়াদকাল	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ
বৃটিশ শাসনামল	গ্রাম চৌকীদারী আইন-১৮৭০	পঞ্চায়েত	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত ৫জন সদস্য	৩ বছর	❑ ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে চৌকীদারদের বেতন পরিশোধ। ❑ সর্বনিম্ন ট্যাক্স হার ছয় আনা। ❑ পঞ্চায়েত সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।
	বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন-১৮৮৫	ইউনিয়ন কমিটি	৫থেকে ৯জন নির্বাচিত সদস্য	২ বছর	❑ কমিটি জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত হয়। ❑ আইন শৃংখলা রক্ষা ও কর আদায় করা। ❑ ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকে।
	বংগীয় পল্লী স্বায়ত্ব শাসন আইন-১৯১৯	ইউনিয়ন বোর্ড	মোট সদস্য সংখ্যা ৬-৯জন ❑ এক তৃতীয়াংশ সদস্য জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ❑ মনোনীত সদস্য সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ। ❑ ১৯৪৬ সালে মনোনয়ন প্রথা রহিত করা হয়। ❑ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।	৩ বছর (১৯৩৬ সালে মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৪ বছর করা হয়)	❑ বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান রাখা হয়। ❑ ট্যাক্স আরোপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ❑ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তথ্য সরবরাহ। ❑ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারীর পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড বিদ্যমান ছিল।
পাকিস্তান শাসনামল	মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯	ইউনিয়ন কাউন্সিল	১০ হতে ১৫ জন সদস্য। ❑ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত ❑ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত ❑ সদস্যদের ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত (১৯৬৩ সালে ভাইস-চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা হয়)	৫ বছর	❑ ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। ❑ ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনে সদস্যদেরকে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ❑ কাউন্সিলে চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানী প্রদানের প্রথা চালু। ❑ কাউন্সিলকে বেশী মাত্রায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করা এবং আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।
বাংলাদেশ শাসনামল	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭, ১৯৭২	ইউনিয়ন পঞ্চায়েত	❑ প্রশাসক নিয়োগ		——
	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২, ১৯৭৩	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন। ❑ প্রতি ওয়ার্ডে ৩জন করে মোট ৯ জন সদস্য জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত।		❑ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ❑ পরিষদের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

ফিকচারের বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায়

ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন/আদেশ/অর্ডিন্যান্স

পর্যায়	আইন/অধ্যাদেশ আদেশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সংস্থার নাম	গঠন কাঠামো	মেয়াদকাল	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ
	স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-১৯৭৬	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ১জন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য নির্বাচিত। ❑ মনোনীত ২জন মহিলা সদস্য ২জন কৃষক প্রতিনিধি।	৫ বছর	❑ ইতোপূর্বের ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অবলুপ্ত। ❑ পৌর, রাজস্ব, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক ৪০জন কার্যাবলীর দায়িত্ব প্রদান। ❑ ১৯৭৬ সালে জারীকৃত ভিলেজ অর্ডিন্যান্স বলে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান।
বাংলাদেশ শাসনামল	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৩জন করে মোট ৯জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১জন মনোনীত মহিলা সদস্য।	৩ বছর (১৯৮৭ সালে সংশোধনী আদেশক্রমে ৫ বছর	❑ পৌর, রাজস্ব, প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন -১৯৯৩	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ ৯জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ মহিলাদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা।	৫ বছর	❑ সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ❑ নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে ৬টি খাত নির্ধারণ। ❑ ৭টি স্টান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান।
	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন - ১৯৯৭	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ ৯ জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ মহিলাদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা।	৫ বছর	❑ পরিষদের নির্বাচন যদি কোন কারনে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অনুষ্টিত হতে না পারে তবে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যেরূপ সময়সীমা ধার্য করে দিবেন, তদনুযায়ী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্টিত হতে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আসবে না।
বাংলাদেশ শাসনামল	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন-১৯৯৭	ইউনিয়ন পরিষদ	❑ ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ❑ ৯টি ওয়ার্ডের জন্য ৯ জন নির্বাচিত সদস্য। ❑ ৩জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ১টি মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকবে)		❑ সংরক্ষিত মহিলা আসনে ছাড়াও যে কোন মহিলা ভোটার পুরুষদের সাথে সাধারণ সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ❑ সংরক্ষিত ৩টি মহিলা আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে থানা নির্বাহী অফিসার ৯টি ওয়ার্ডকে ৩টা ওয়ার্ডে পুনঃ যোজিত (Delimited) করতে পারবেন এবং এরূপ পুনঃযোজিত ওয়ার্ডগুলির তালিকা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আইন বা বিধি-বিধানের দিক থেকে বিবেচনা করলে এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য যথেষ্ট আইনগত ভিত্তি আছে, আইন ও বিধি বিধানের দিক দিয়ে এদেশের ইউনিয়র পরিষদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাস্তবতার নিরীখে যাই হোক না কেন, তাত্ত্বিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের তৃণমূল পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক। ইউনিয়ণ পরিষদ কি কি কাজ করবে তা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর প্রথম তফসীলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা'ছাড়া গ্রামীণ পুলিশের (সাধারণভাবে চৌকিদার হিসেবে পরিচিত) কার্যাবলীও তফশীলে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। উক্ত তফশীলের আলোকে বলা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সাধারণভাবে সম্পন্ন করে থাকে ঃ

১। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে থানা ও জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করা

২। অপরাধ অনুষ্ঠান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা প্রদান

৩। কোন অপরাধ সংঘঠিত হলে বা ইউনিয়নে কোন দুষ্কৃতকারীর উপস্থিতি দেখা গেলে তা পুলিশকে জানানো। অপরাধ তদন্ত ও অপরাধীকে গ্রেফতারে পুলিশকে সাহায্য করা

৪। সরকার বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ অনুযায়ী ইউনিয়নের মধ্যে প্রচার কার্য সম্পাদন

৫। কোন সরকারী রাস্তা, সরকারী জায়গা, সরকারী ভবনের ক্ষতি বা বেদখলের ঘটনা ঘটলে তা সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো

৬। সরকার নির্দিষ্ট পল্লী এলাকায় গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, নিয়মশৃঙ্খলা এই চারটি শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তফশীলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ দায়িত্বপালন করবে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক যদি মনে করেন যে, কোন ইউনিয়ন অথবা এর কোন অংশে গ্রাম প্রতিরক্ষা বা জন নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বা এর অংশ বিশেষের সকল সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীকে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টহলদারীর দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ জারী করা হলে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত নির্দেশে নির্ধারিত ক্ষমতার ব্যবহার করবে

৭। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত ভাবে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ

৮। স্থানীয় দুঃস্থ ব্যক্তি, ভিক্ষুক, অন্ধ, অক্ষম; এ ধরনের বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ

৯। সব ধরনের শুমারী পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান

১০। থানা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করা

১১। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সব ধরনের রাজস্ব কর্মচারীদের রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং সাধারণ প্রশাসনিক কার্যে সহযোগিতা প্রদান

১২। জেলা প্রশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী রেকর্ড পত্র প্রণয়ন, জরিপ ও শস্য পর্যবেক্ষণ এবং ইউনিয়নের অন্যান্য রাজস্ব প্রশাসন কাজে সহযোগিতা প্রদান

১৩। স্থানীয় সম্পদের সমাবেশকরণ, উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার

১৪। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করা

১৫। সরকারী সম্পত্তি যেমন সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ

১৬। ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্ম তৎপরতার পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে থানা ও জেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণ

১৭। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা

১৮। স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্থ করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো

১৯। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্ম তৎপরতায় উন্নতি ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

২০। বিধি মোতাবেক নির্ধারিত কার্যসীমা পর্যন্ত একটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে যা ইউপি চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি সরাসরি নিজে অথবা অধ্যাদেশ মোতাবেক দায়িত্ব প্রদান করে অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারবেন। ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় কার্য ইউনিয়ন পরিষদের নামে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাধা করতে হবে।

২১। সামগ্রিকভাবে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনগণের ব্যবহার্য পথে ও রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা

২২। কবরস্থান, শ্মশান ঘাট,জনসমাবেশ ও জনসম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা

২৩। জীবনান্তর মৃতদেহ অপসারণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ করা

২৪। আবাসিক এলাকায় ইটখোলা, মৃৎশিল্প বা অন্যান্য চুল্লী ব্যবহার নিষিদ্ধ করা

২৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-যেমন আগুন লাগা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা

২৬। পরিবেশ উন্নয়নের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা

২৭। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচি অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ

২৮। খোয়াড় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা

২৯। লাইব্রেরী ও রিডিং রুমের ব্যবস্থা করা

৩০। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

৩১। আবর্জনা ও ময়লা অপসারণ করা, রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার ব্যবস্থা করা

৩২। আবাসিক এলাকায় কাপড় রং করা বা চামড়া পরিষ্কার ও রং করা বন্ধ করা

৩৩। বিধবা অনাথ ও দুঃস্থদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা

৩৪। গ্রাম আদালত প্রধান হিসাবে এলাকায় বিচার বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনে ইউপি চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ এবং জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের সালিশ করেন

৩৫। নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটির মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়নের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকরণ

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা চালাবো। আমাদের মতো গরীব দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যা অনেক। তবে আলোচনার পরিধির সংক্ষিপ্ততার জন্য কয়েকটি মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পরে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাসমূহ

১) **তত্ত্ব ও বাস্তবতার পার্থক্য ঃ** কালের বিবর্তন ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি তাত্ত্বিকভাবে অনেক বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ ইউনিয়ন পরিষদই এই ক্ষমতা বা কার্যপরিধি বাস্তবিকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সামান্যতম পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাত্ত্বিকভাবে যতটুকু ক্ষমতা বা কর্মপরিধি দেয়া হয়েছে, বাস্তবিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদগুলি সেরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেনি।

২) **পর্যাপ্ত অর্থের অভাব ঃ** ইউনিয়ন পরিষদগুলি সরকারী অনুদান নির্ভর। অথচ বর্তমান সময়ের দাবী হলো ইউনিয়ন পরিষদগুলি নিজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং সম্পদের সমাবেশকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান করুক। বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানই ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধির জন্য তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখেন না; বেশ কয়েকজন চেয়ারম্যানের সাথে আলাপকালে চেয়ারম্যানগণের প্রায় সবাই এ কথা স্বীকার করেন যে, তারা ধার্যকৃত ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য তেমন একটা আগ্রহ দেখান না বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন না।

৩) **ক্ষমতা লিপ্সা ঃ** ইউপি চেয়ারম্যানগণ এলাকার উন্নয়নের চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিষয়টিকেই বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন। তাছাড়া ইউপি চেয়ারম্যানদের হাতে আইন অনুযায়ী যেটুকু ক্ষমতা দেয়া আছে তার প্রয়োগের দিকে না গিয়েই তারা আরও অধিক পরিমাণে ক্ষমতা চান। বেশীর ভাগ ইউপি চেয়ারম্যানই মনে করেন যে, তাদের হাতে ম্যাজিষ্ট্রেসী ক্ষমতা দেয়া হলে তারা আরও অনেক বেশী মাত্রায় এবং বেশী উন্নতমানের সেবা জনসাধারণকে দিতে পারবেন। কিন্তু ক্ষমতা ও জনসেবা প্রত্যয় দু'টি পরস্পর বিরোধী। আর বর্তমান সময়ের উন্নয়নমুখী প্রশাসনে জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতা লিপ্সা ত্যাগ করতে হবে সঙ্গত কারণে।

৪) **ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব ঃ** এদেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বার বার সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না থাকায় সরকারের এ মহতী উদ্যোগ সফল হতে পারে না। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যাগণ যথার্থভাবে শিক্ষিত না হওয়ায় তারা অনেক সময়ই বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মসূচির মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম হন না, ফলে অনেক মহতী উদ্যোগই সফল হতে পারে না।

৫) **গ্রাম্য দলাদলির প্রভাব ঃ** ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও তার বিরোধী শক্তির মধ্যে প্রায়শঃই দলাদলির কারণে ইউনিয়ন পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। গ্রাম্য দলাদলির কারণে বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যে প্রায়শঃই মনোমালিণ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, ফলে যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

৬) **ট্যাক্স আদায়ে অনীহা ঃ** ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আদায়যোগ্য ট্যাক্সসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ এবং চেয়ারম্যান প্রায়ই অনীহা দেখিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ ধারণা করেন যে, ধার্য্য করা ট্যাক্স যথাযথভাবে আদায় করলে গ্রামের সাধারণ ভোটারগণ তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে, যা তাদের ভবিষ্যতে নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হতে পারে। এ কারণে তারা ট্যাক্স আদায় থেকে বিরত থেকে ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে যথার্থ প্রকল্প গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করেন।

৭) **দলীয়করণের প্রভাব ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপরে জাতীয় সরকার প্রায়ই দলীয়করণের চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, ক্ষমতাসীন সরকারী দল (অতীতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের উপরে অযাচিতভাবে রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। যে সব চেয়ারম্যান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির সাথে একীভূত হয়ে যান তাদের ব্যাপারে কোন সমস্যা সাধারণত হয় না, কিন্তু যে সব চেয়ারম্যান নিজস্ব আদর্শ এবং নীতিকে বিসর্জন দিয়ে দলীয়করণ প্রক্রিয়ায় শরীক হতে চান না তারা ক্ষমতাসীন সরকারী দলের রোষাণলে পতিত হন। এতে ইউনিয়ন পরিষদগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বিঘ্ন ঘটে থাকে।

৮) **উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণে ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যে সরাসরি বিরোধ ঃ** কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের সময় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যে প্রায়ই স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। বিশেষত কোন রাস্তা নির্মাণের সময় কার বাড়ীর পাশ দিয়ে রাস্তাটি নেয়া হবে সে জন্য লবিং এবং এন্টি লবিং শুরু হয়। যারা তদ্বির করে অথবা শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তারাই সম্পদের ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লাভবান হতে পারেন। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াই বাধাগ্রস্ত হয়।

৯) **বাজেট প্রণয়নে অদক্ষতা ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটগুলি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, প্রণীত খসড়া বাজেটগুলি যথাযথভাবে প্রণয়ন করাতো হয়ইনা বরং সেগুলি দায়সারা গোছের প্রক্রিয়ায় প্রণয়ন করা হয়। বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে বিধি মোতাবেক বাজেট সভা যথাসময়ে আহ্বান করা হয় না। আর বাজেট প্রস্তুতিমূলক সভা বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে একেবারেই অনুষ্ঠিত হয় না মর্মে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। ফলে ইউপির বাজেটগুলির মান অত্যন্ত খারাপ হয় যা সামগ্রিক কার্যক্রম (ব্যাহত) করে থাকে।

১০) **জাতীয় সরকারের সাথে একাত্মতার অভাব ঃ** দেশের সমগ্র ইউনিয়ন পরিষদকে দেশের সামগ্রিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদগুলি যথাযথভাবে জাতীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে পারে না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবর্গ একটি নির্দিষ্ট পল্লীর বাসিন্দা হওয়ায় তাদের মনমানসিকতা এবং আচরণে পশ্চাৎমুখিতা বিরাজ করে। ফলে আধুনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিজ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে সমান তালে কাজ করতে অথবা এগিয়ে যেতে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদগুলি সক্ষম হচ্ছে না।

১১) **গ্রাম পুলিশদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার স্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদারগণ) দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ পুলিশ বয়োবৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে প্রায় অক্ষম। তাছাড়া তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তারা কল্যাণমূলক কাজ করতেও সক্ষম নয়। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের বিধিমালা অনুযায়ী ন্যূনতম সেবাও এই ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব হয় না।

১২) **ইউপি সচিবদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা ঃ** বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যাপ্ত নয় বলেই বিবেচিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে এটাই বর্তমানে কাম্য। আর ইউনিয়ন পরিষদের সমুদয় দাপ্তরিক কর্মকান্ড এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করা সহ সমুদয় কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব ইউপি সচিবের কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এদেশের ইউপি সচিবগণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শিক্ষিত নয়, উপরন্তু তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনাসমূহ

১) **স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সমাবেশকরণ ও তার যথার্থ ব্যবহার ঃ** স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সমাবেশকরণে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনা অনেক। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশ। দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিত করে তা আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় ১৮লক্ষ একর জমি এখনও অনাবাদী রয়েছে। পতিত এসব জমির অধিকাংশই পল্লী এলাকা তথা ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। এসব পতিত জমি জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে উৎপাদনমুখীভাবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া দরকার আর এ কাজ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করা সম্ভব। উপরন্ত ইউনিয়ন এলাকায় পতিত থাকা অনেক হাজা-মজা পুকুর, ডোবা ও খালবিল ইত্যাদি ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় উৎপাদনশীল খাতে পরিণত করা যায়।

বর্তমানে গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপাদনমুখী খাতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে যে সব মাঠকর্মী কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করলে জাতীয় উন্নয়নের সমভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে বাধ্য।

২) **জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঃ** জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দু'হাজার সালের মধ্যে এদেশের সকল মানুষের জন্য পাকা-পায়খানা এবং বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নলকূপের পানি ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। কিন্তু গত দু'বছর যাবৎ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যখন ইউনিসেফের পরমার্শ মোতাবেক জেলা ও থানা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক কর্মসূচি নেয় তখন এ কর্মসূচি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'ওয়াটশন কমিটি'র চেয়ারম্যান হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে যখন এই কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য যে কোন কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা থাকলে সেই কর্মসূচির সাফল্য অনেক বেশী আসবে।

৩) **পল্লী অবকাঠামো গঠন ও বিকাশ ঃ** গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দরকার হলো পল্লী অবকাঠামো তথা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন। ইউনিয়ন পরিষদগুলি রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও নতুন নতুন রাস্তা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪) **বৃক্ষরোপণ এর মাধ্যমে উন্নয়ন ঃ** পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জাতীয় সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সমস্ত পতিত জায়গা, প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়ীর আশে পাশে বৃক্ষরোপণ করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সাফল্যের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় উন্নতি সাধন করতে পারে।

৫) **পরিবার পরিকল্পনা ও ই, পি, আই কর্মসূচি সাফল্যমন্ডিত করণ ঃ** জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিতকরণের সাথে সাথে শিশুদেরকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠার পন্থা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা এবং ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

৬) **জনশক্তির সফল ব্যবহার ঃ** এদেশের জনশক্তি একটি বিশাল সম্ভাবনাময় সম্পদ। এ জনশক্তিকে উৎপাদনমুখী বা অর্থকরী পেশায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদসমূহ আহরণ করে উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হবে কুটির শিল্পের মতো শ্রম-নির্ভর প্রকল্প গ্রহণের, যাতে অল্প মূলধনে বেশী শ্রমিক নিয়োগ করা যায়।

৭) **নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টি ঃ** বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদগুলি সরকারী অনুদানের উপরে অত্যধিক নির্ভরশীল। ফলে ইউনিয়ন পরিষদগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করছে। অথচ ধার্যকৃত করসমূহ যদি যথাযথভাবে আদায় করা যেতো তবে আদায়কৃত কর দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলির অবস্থারই শুধু উন্নতি হতো না, বরং ইউনিয়ন এলাকার সমগ্র জনগণের ভাগোন্নয়নের পথ সুগম হতো।

৮) **কর বহির্ভূত খাত সমূহ থেকে আয় ঃ** ইউনিয়ন পরিষদ কর ছাড়াও কর বহির্ভূত খাতসমূহ; যেমন-বৃক্ষরোপণ, শাকশজির বাগান,নার্সারী, হাঁস-মুরগীর

খামার, মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, দোকান ঘর নির্মাণ ইত্যাদি হতে আয় বর্ধনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। থানা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপকরণের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ করতে পারে। স্থানীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কর আরোপের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। এজন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সক্রিয় করে তোলার জন্য ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৯) **গণশিক্ষা ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ** বর্তমান বিশ্বে উন্নতি বা অগ্রগতি অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এদেশের সকল নাগরিককে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সমস্ত স্কুল গমন বয়সী শিশুকে স্কুলে নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণ ও সদস্যগণের সহযোগিতা অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির সাফল্যজনক বাস্তবায়নের সাথে সাথে বয়স্কদের জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ইউপি চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা ব্যতীত অসম্ভব। অর্থাৎ এদেশের সকল মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সরকারী সকল কর্মসূচিই ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় নিষ্কন্টকভাবে সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আশা করা যায়।

সর্বশেষে বলা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ হলো তৃণমূল পর্যায়ের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান, যা কিনা গ্রামীণ পর্যায়ে সরকারের সব ধরনের কার্যক্রম বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। আর ইউনিয়ন পরিষদ এখনও পর্যন্ত একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সরকারের সবধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সুতরাং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলির সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার ঃ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূল

পর্যায়ের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে যুগের দাবীর সাথে তাল রেখে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ার সাথে সাথে এ সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ সব ধরনের সরকারী উদ্যোগের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে বিবেচনা করায় ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাবনার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এখন প্রয়োজন যোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ ও চেয়ারম্যানের, যিনি তাঁর একাগ্রতা, সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়নতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সচেষ্টা হবেন। আর যখন বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রকৃতভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনতে সচেষ্ট হবেন তখন আমাদের সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), (১৯৮২) *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

২। ভূইয়া, মোহাম্মদ আবুল অদুদ, (১৯৭৯) *লোক প্রশাসনের রূপরেখা*, ঢাকা বুক হাইজ।

৩। হক, আবুল ফজল, (১৯৭৪) *বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৪। Ali AMM, Showkat, (1982) *Field Administration & Rural Development in Bangladesh*. Dhaka, CSS.

৫। ALi Shaik Maqsood etal, (1983) *Decentralization and people's Participation in Bangladesh*. Dhaka, NIPA.

৬। Dhaka University, (1980) *Department of Political Science. Politician and Administration in Bangladesh*. Dhaka.

৭। Khan, Md. Mohabbat and Zafourllah, Md. Habib (ed), (1981) *Rural Development in Bangladesh : Tern and Issues*. Dhaka, Centas.

৮। Rahman, Atiur, (1981) *Rural Power Structure : A Study of the Local Level Leader in Bangladesh*. Dhaka, BBI.

৯। Alam, Manjur-ul, (1977) *Local Government at Work in Rural Bangladesh*. Journal of BARD, Vol-VI, No, 2, 1977, PP. 17-25.

১০। Islam, Shamsul, (1977) *Local Government and National Development Quarterly*. Vol-6c No-3,

১১। Molla, Md. Giasudidn, (1978) *New Hopes for Union Parishads : Case of Bangladesh*. Administrative Science Review, Vol-VIII, No-1, 1978, PP 43-47.

১২। Rahman M. LUTFUR and Das, NR, (1980) *Union Parisha Taxes : Nature of Payment by the farmers*. Administrative Science Review, Vol-X, No.4,m 1980 PP. 17-28.

১৩। আজম, কে, কিউ এবং হোসাইন, আলী আজম, (১৯৭৯) *ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা-চেয়ারম্যানবৃন্দ যেভাবে ব্যক্ত করছেন।* Local Government Quarterly, Vol-8, No-1-4, 1979, PP. 52-57.

১৪। আলম, জগলুল, (১৯৮২) *গ্রামীণ প্রশাসন ঃ কয়েকটি সমস্যা।* দৈনিক বাংলা, ২৯শে জুলাই।

১৫। রহমান এ, এইচ মোঃ আমিনুর, (১৯৭৮) *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।* Local Government Quarterly, Vol-7, No-1-4.

১৬। Ahmad, J, Minhasuddin, (1980) *Training of Union Parishad Chairmen'* Bogra, RDA, 1980.

১৭। Alam Manjurr : (1976) *Leadership Pattern, Problems and Prospect of Local Government* in Rural Bangladesh: Comilla, BARD.

পুস্তক পর্যালোচনা ঃ রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা

(অনুবাদ ঃ কবি শামসুর রাহমান)

মোঃ আনোয়ার হোসাইন *

কবি পরিচিতি

সমকালীন মার্কিন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবার্ট ফ্রস্টের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৮৭৫ সালের ২৬শে মার্চ। মূলত নিউ ইংল্যান্ডের একটি প্রাচীন পরিবারের সন্তান তিনি। রবার্ট ফ্রস্টের পূর্বপুরুষ ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। তাঁর মায়ের নাম ইসাবেল মুডি, যিনি ছিলেন একজন শিক্ষিকা, বাবার নাম উইলিয়াম প্রেসকট ফ্রস্ট, যিনি প্রথমে ছিলেন একজন শিক্ষক, তারপর সম্পাদক এবং তারও পর রাজনীতিক।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় কবি বলে পরিচিতি হওয়ার বহু পূর্বে রবার্ট ফ্রস্ট নিজের হাতে চাষের কাজ করতেন। তারও আগে ম্যাসাচুসেটস এর একটি মিলে সুতো গুটানোর কাজ করতেন, তাছাড়া জুতো তৈরী ও গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতার কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে রবার্ট পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা'র সঙ্গে ফিরে যান নিউ ইংল্যান্ডে, সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে মানুষ হন। বেশ বড় বয়সে (১৪ বছর) তার পড়াশোনা শুরু হয়। ইমার্সনের দার্শনিক ভাবধারার চেয়ে পো'র গীতিধর্মিতা তাঁর বেশী ভালো লাগে। বস্তুত কবিতার গীতিময়তাই তাঁর কবি মানসকে প্রথম আকর্ষণ করে।

পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় লরেন্স হাইস্কুল বুলেটিনে। উনিশ বছর বয়সে 'দি ইনডিপেনডেন্ট' পত্রিকা সম্মানী দিয়ে তার কবিতা গ্রহণ করেণ। বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো তাঁকে প্রকৃতপক্ষে। রবার্ট ফস্টের প্রথম বই 'এ বয়েজ উইল' বিশ বছর পরেই প্রকাশিত হয়েছিলো, আর প্রমাণ করেছিলো তিনি সত্যিকার একজন কবি।

---

* উনবিংশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থী (ক্রমিক নং খ-২২৬), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

১৯১৫ সালের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই ফ্রস্ট এলেন আমেরিকায়। এসে দেখেন তিনি রীতিমত বিখ্যাত হয়ে গেছেন। তাঁর দু'খানি বইই বিক্রি হচ্ছে এখানকার দোকানে দোকানে। যে অজ্ঞাত কবি আমেরিকা ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তিনিই ফিরে এলেন 'মার্কিন কাব্যের নব-যুগের' নেতা হয়ে। ফ্রস্টকে শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য তিনবার 'পুলিৎজার' পুরস্কার দেয়া হয়। এ সৌভাগ্যটি সমকালীন কবিদের আর কারো হয়নি। ১৯৩১ সালে কালেক্টেড পোয়েমস এর জন্যে; ১৯৩৭ সালে 'এ ফার্দার রেঞ্জ' ও ১৯৪৩ সালে 'এ উইটনেস ট্রি'র জন্যে তাকে পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অন্যান্য সম্মানও এসেছে প্রায় সাথে সাথেই।

১৯১৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আমহার্স্ট কলেজের ফ্যাকাল্টিতে থাকেন তিনি। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল এবং পুনরায় ১৯২৫-২৬ সালে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কবির সম্মানলাভ করেন। ১৯৩৬ সালে হার্ভার্ডে তিনি চার্লস ইলিয়ট নটন লেকচার প্রদান করেন। ভারমন্টের গ্রীন মাউন্টেন্সে তিনি বিখ্যাত 'ব্রেড লোভ স্কুল অব ইংলিশ' শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতাও করেন। কলম্বিয়া, ডার্টমাউথ, ইয়েল, হার্ভার্ড এবং অন্যান্য আরো কতকগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনারারী ডিগ্রি প্রদান করেন। যে অল্পসংখ্যক লেখক ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব আর্ট এন্ড লেটার্স থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

এইসব সম্মান কোনদিনও কবি ও মানুষ ফ্রস্টকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাঁর একক শক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয় তাঁর মানবসত্তা ও কর্মে সমভাবে বিদ্যমান। একটি কর্মবহুল জীবনযাপন শেষে ১৯৬৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী, ৮৮ বছর বয়সে কবি বোস্টনের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমালোচনা ঃ আংগিক / বিন্যাস /অলংকরণ

রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত ৫০টি কবিতার এই সংকলনটি মূলত আমার দৃষ্টি কেড়েছে বইটি প্রকাশনার সময় দেখে। সমসাময়িক কালে এ ধরনের একটি নান্দনিক গঠনের প্রকাশনা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বৈ কি। বইটির প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৮ ইং (মোতাবেক আশ্বিন, ১৩৭৫ বাংলা), প্রকাশ করেছে সে সময়ের অন্যতম অগ্রণী প্রকাশনা সংস্থা 'খোশরোজ কিতাব মহল'। প্রায় তিন দশক পূর্বে প্রকাশিত বইটির ছাপা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। ছাপা হয়েছে মনোটাইপ লেটার প্রেসে। কবিতার শিরোনাম লিখিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত বড় নান্দনিক কনডেন্সড্ হরফে। কবিতার 'বডি' প্রায় দশ দশমিক পাঁচ পয়েন্ট হরফে ছাপা।

পুস্তকের পরিচিতি পাতায় লিখা হয়েছে "Bengali Translation of fifty poems of Robert Frost, selected with introduction of & commentary by louis Untermeyer, Copyright 1930, 1939, 1943, 1946, 1958, 1967 by Holt Rinehart & Winston Inc. Copyright 1936 by Robert Frost. Copy 1964 by Lesley Ballantine. This edition was published by arrangement with Holt, Rinehart & Winston Inc."

এই পরিচিতি থেকে কবিতাসমূহ প্রকাশের প্রথম সময়কাল জানা যাচ্ছে। তবে একটা বিষয় কিছুটা অস্পষ্ট যে, নির্বাচিত কবিতার এই সংকলনটি কোথায় কার দ্বারা নির্বাচিত ও সংকলিত হয়েছে। লুই আন্টারমেয়ারের ভূমিকা ও সমালোচনায় বিষয়টি উল্লিখিত হয়নি; এমনকি পরিশিষ্টে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর লিখাতেও এ সম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়নি। তবে কবিতার বিন্যাস ও গাঁথুনি দেখে ধারণা করা যায় যে, এটি খুব সম্ভবত সরাসরি অনুবাদ কর্ম যার পরিশিষ্টে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নিবন্ধটি সংযুক্ত হয়েছে।

এই কবিতা সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট একটি দিক হচ্ছে, বেশীরভাগ কবিতার সাথে উপযুক্ত নিসর্গচিত্রের অলংকরণ এবং সংক্ষিপ্ত কবিতা পরিচিতি/সমালোচনা। তবে বইয়ের কোথাও অলংকারিকের নাম খুঁজে পাওয়া গেলো না। অবশ্য প্রতিটি কবিতার পৃথক পৃথক ভূমিকা লুই আন্টারমেয়ার কর্তৃক লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই ভূমিকাংশ বইটিকে তথা পৃথকভাবে প্রতিটি কবিতাকে উপভোগ্য করতে সাহায্য করে, বিশেষত যাঁরা কবিতার অন্তরতম রসানুসন্ধান করেন তাঁদের জন্য এটি অতিরিক্ত চিন্তার খোরাক যোগাবে।

অনুবাদ (সমালোচনা)

এ দেশের আরেকজন বরেণ্য কবি, যিনি তাঁর স্বীয় কর্মের দ্বারা আধুনিক বাংলা কাব্যের অঙ্গনে শীর্ষ স্থানটি ইতোমধ্যেই অর্জন করেছেন, সেই কবি শামসুর রাহমান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। শামসুর রাহমানের কবি পরিচিতির বাইরে সার্থক অনুবাদক হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে এই অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে। এই অনুবাদ প্রাঞ্জল ও স্বতস্ফূর্ত; বেশীরভাগ অনুবাদ কর্মের মতো এখানে ভাষার আড়ষ্টতা নেই; আছে স্বাভাবিক গতিময়তা-শব্দের যথাযথ প্রয়োগ। বিশেষত যে সব কবিতায় ছন্দের অন্তমিলের বিষয়টি মুখ্য, সেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগ ও কবিতার যথাযথ ভাবের প্রকাশসহ ছন্দের সংরক্ষণ প্রশংসনীয়। যেমনটি দেখা যায় ফ্রস্টের

'DESIGN' শীর্ষক কবিতায়। অনুবাদক কর্তৃক এটি অনূদিত হয়েছে 'অভিসন্ধি' নামে। কবিতাটিতে একটা সাদা মাকড়শার উল্লেখ আছে। সেই সাদা মাকড়শা ধরে রেখেছে একটা সাদা পোকাকে-এতে একটা পূর্ণ সাদা রংয়ের বিন্যাসের জন্ম হয়েছে। এই বিভ্রান্তি আর অন্ধকারের জগতের একটা উদ্দেশ্য, একটা অভিসন্ধি রয়েছে-এই ভাবটাই ব্যক্ত হয়েছে 'ডিজাইন' কবিতায়।

"... কেন সেই ফুলটিকে ঘিরে
সাদা রঙ? এ ভোর বেলায় কেন সব সাদাময়?
কে আনলো মাকড়শাটিকে অত উর্ধ্বে ধীরে ধীরে,
তারপর পোকাটাকে নিয়ে গেলো সেখানে রাত্রি?
এত ক্ষুদ্র বস্তু যদি দূরভিসন্ধি শাসিত হয়,
আঁধারের অভিসন্ধি পারে সে কি না দেখিয়ে ভয়?"

এছাড়া ফ্রস্টের সরল প্যাষ্টোরাল কবিতাগুলো অনুবাদ করতে গিয়ে যেভাবে সরল শব্দের আবহে শব্দকল্প/চিত্রকল্প তৈরী করেছেন, তা এক কথায় অসাধারণ। যেমন আছে The Cow in Apple Time (আপেলের দিনে গরুটা) কবিতায়। গরুটা অনেকগুলো পাকা আপেল খেয়ে ফেলেছে, তার ফলে "Scorus a pasture withering to the root." ছিবড়ো-মাথা মুখে আপেলের রসে মাতাল হয়ে লাফিয়ে টপকে পেরুচ্ছে ফটক আর দেয়াল। কোন বাধাই তার পথরোধ করতে পারছেনা।

"সেই গ্রীষ্মে কি যে হলো হঠাৎ নিঃসঙ্গ গরুটার
দেয়ালটা নিমেষে ডিঙ্গিয়ে গেলো, যেন
খোলা দোর। দেয়াল বানায় যারা বোকা বটে তারা।
সারা চোখে-মুখে তার অপেলের ছিবড়ে লেগে আছে,
কষ বেয়ে পড়ে রস, যখন পেয়েছে স্বাদ রসাল ফলের
রোচেনাকো মুখে আর গোচর মাঠের শুকনো ঘাস।"

মোটের উপর এটা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, অনুবাদক ফ্রস্টের কবিতার বার্তা আমাদের কাছে অতি প্রাঞ্জল এবং সার্থকভাবেই পৌছে দিয়েছেন। অনুবাদক এখানে সার্থক।

অংগশৈলী ছাপা/বাঁধাই / অংগসজ্জা / মূল্য (সমালোচনা)

বইটির বাঁধাই এবং অঙ্গসজ্জা এক কথায় 'চমৎকার'। প্রচ্ছদে কবির তৈলচিত্রের একটি ফটোগ্রাফ রয়েছে। এটিকে বোধ হয় আরও শিল্পীতভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ ছিলেন। তিন রং এর প্রচ্ছদে সবগুলো রংকে সমানভাবে exploit করা যায়নি। হার্ডবোর্ড বাঁধাই এর উপর মোটা কাগজের জ্যাকেট সমসাময়িকতার নিরীখে অবশ্যই ভালো। জ্যাকেটের ইনার ফোল্ডে ভূমিকাটি খুব একটা সুলিখিত হয়নি বলা চলে। মূলত লুই আন্টারমেয়ারের ভূমিকাংশ এটি; যা সুগ্রন্থিত নয়। এখানে অনুবাদক বা প্রকাশকের উদ্দেশ্য বিধৃত হলেই বোধ হয় ভালো হতো। কারণ লুই আন্টারমেয়ার এবং প্রফেসর কবীর চৌধুরীর ভূমিকা ও পরিচিতির পর এই ভূমিকাংশের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিলো মনে হয়না। বইয়ে ব্যবহৃত কাগজ এবং সেলাইকৃত বাঁধাই উত্তম। জাতীয় মুদ্রণ এর ছাপা খুবই ভালো। লিংকম্যান এন্ড কোম্পানী সম্ভবত সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্লক প্রস্তুতকারক। ব্লকে ছাপা অলংকরণ এর সূক্ষ্ণ ডিটেলসমূহ বাদ যায়নি।

সূচিপত্রে কবিতার অনূদিত নামের সাথে মূল ইংরেজী নাম প্রদর্শন করা হয়েছে এছাড়া প্রতিটি কবিতার নীচে ছোট্ট রোমান হরফে মূল ইংরেজী নাম প্রদর্শন করা হয়েছে, এ কাজটি প্রশংসনীয়। ইনারে একাধিকবার বইয়ের টাইটেল প্রদর্শিত হয়েছে, এর যুক্তিসংগত কোন প্রয়োজন ছিলো বলে মনে হয় না। বইটির দাম দেখানো আছে মাত্র তিন টাকা। এই দাম সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কতোটা যুক্তিসঙ্গত বলা রীতিমত গবেষণাসাপেক্ষ। তবে মূল্য সূচকের হিসেবে এই দাম যথেষ্ট সহনীয় প্রতীয়মান। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত তেলরং এ কবির ছবিটি পুনরায় ভূমিকার পূর্বে আলাদা প্লেটে ছেপে যোগ করা হয়েছে, এখানে ভিন্ন চিত্র ব্যবহৃত হলে ভালো হতো।

বিষয়বস্তু

সংকলনের নির্বাচিত কিছু কবিতা

রবার্ট ফ্রস্টের মোট ৫০টি নির্বাচিত কবিতার সম্মিলন ঘটানো হয়েছে এই সংকলনে। তাঁর কাব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠনের জন্য সম্পূর্ণ বইটির বিষয়বস্তু এবং একই সাথে ফ্রস্টের কাব্যচিন্তা সম্পর্কে বোঝার জন্যে অধিকতর নির্বাচিত ক'টি কবিতার বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলো।

The Tuft of flower (ফুলের গুচ্ছ)

এটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা। মানবিক সংযোগের পূর্ণ সূরটি বর্ণিত হয়েছে এই কবিতায়। এমনকি যাদের ধারণা যে,তারা সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে একা-একা কাজ করে; তাদের মধ্যেও একটা যোগাযোগ রয়েছে।

The Vanishing Red (বিলীয়মান লাল)

এই কবিতায় ফুটে উঠেছে ফ্রস্টের ট্রাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত দি ভ্যানিশিং রেড বলতে রেড ইন্ডিয়ানদের ক্রমবিলুপ্তির কথা বোঝানো হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা গোটা আঞ্চলিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্রস্টের কবিতাবলীর কুশীলবদের চেনা যায় তাদের হাস্যরস বোধের মারফত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শান্তশিষ্ট, কেউ কেউ হৈ চৈ পছন্দ করা আমুদে লোক, কেউ কেউ বাচাল, আবার কেউ কেউ স্বল্পভাষী। কবিতাগুলো ছোট; একজন সমালোচকের মতে সেগুলো গ্রানাইটের মতো নিরাবরণ।

Love and a Question (প্রেম এবং একটি প্রশ্ন)

কবিতাটিতে একটি কাহিনী কিংবা তার অংশ বর্ণিত হয়েছে। আসলে পরিশেষে কি ঘটেছে তা পাঠককে আঁচ করে নিতে হবে। কবিতার পটভূমি অত্যন্ত বাস্তব। গ্রামের একটি বাড়ী, একজন লোক আর তার তরুণী বধূ, আর রাতের সেই অচেনা অতিথি, এই নিয়েই কবিতা। কিন্তু কেমন গা ছমছম করা আবহাওয়া। অচেনা লোকটার বর্তমান পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছে অন্য এক পরিচয়। শিরোনাম অনুযায়ী কবিতাটি একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

The Hill Wife (পাহাড়ী ঘরণী)

দি হিল ওয়াইফ-এ পাঁচটি কবিতা গ্রথিত। ৫টি ছোট ছোট লিরিক। এখানে ফ্রস্ট-এর আশ্চর্য বাণী মাধুরীতে ফুটে উঠেছে ভয়, ভালোবাসা আর নিঃসঙ্গতার চিত্র। বিশেষ করে 'লোনলিনেস' এবং 'দি স্মাইল' এই দু'টি অংশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসচেতন পাহাড়ী ঘরণীর মর্মবেদনা।

The Telephone (টেলিফোন)

কখনো কখনো বলা হয় ফ্রস্ট এতো মিতভাষী যে, তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক বলা চলে। প্রেমের কবিতায় তিনি নিজের সম্পর্কে কিছুই উচ্চারণ করেননি-এমন কথাও শোনা যায়। কিন্তু এই উক্তি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ফ্রস্ট প্রত্যেক কবির মতোই তাঁর নিজের সত্তাকে ব্যক্ত করেছেন সমগ্র রচনাবলীতে। কী তাঁর দৃষ্টি কুশীলবের প্রতিকৃতিতে, কী তার আত্মপ্রকৃতি/আত্মপ্রতিকৃতিতে; সর্বত্রই ফ্রস্টের ব্যক্তিস্বরূপ পরিস্ফুট। দি টেলিফোন কবিতাটি হাল্‌কা ধরনের। কিন্তু মনে রাখতে হবে হাল্‌কা অর্থে তরল নয়। কবিতাটির শিল্পসুষমাও অনস্বীকার্য।

The Death of the Hired Man (মজুরের মৃত্যু)

এই কবিতাটি সংকলনের মধ্যে দীর্ঘতম। এটিকে বিভিন্ন ধরনের কবিতা বলা যেতে পারে। যেমন বলা যায়-কাহিনীকাব্য, সংলাপও বলা যায়, এমনকি নাটকও; একাংকিকা হিসেবে সাফল্যের সংগে এ কবিতাটি অভিনীতও হয়েছে। এ কবিতা বা কাহিনীকাব্যের পাত্রপাত্রী তিনজন; একজন চাষী, তার স্ত্রী এবং বুড়ো অক্ষম দিনমজুর। দিনমজুরটি আশ্রয়হীন; কিন্তু ওর মধ্যে গর্ববোধটুকু জাগ্রত। যে চরিত্রটি সবেচেয়ে বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়না একবারও। নানাবিধ কারণে কবিতাটি বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

কিছু সংখ্যক পাঠক কবিতাটিকে এর সংলাপের সৌন্দর্য, সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে অসাধারণ বোধের জন্যে প্রশংসা করেছেন। এ কবিতার আদ্যন্ত রয়েছে প্রকৃত ক্ষমতার নির্ভুল স্বাক্ষর। আবার এর বাগৈশ্বর্যমন্ডিত বর্ণনায় মুগ্ধ হয়েছেন অনেকে।

Part of a moon was falling down the west
Dragging the whole sky with it to the hills,
Its light poured softly in her lap. She saw it
And spread her appron to it. She put out her hand
Among the harp like morning-glory strings,
Taut with the garden bed to caves,
As if she played unheard some tenderness
That wrought on him beside her in the night.

সম্ভবত কবিতাটির সবচেয়ে বিখ্যাত পংক্তি সেগুলো যেখানে চাষী দম্পতি বাড়ির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে চেষ্টা করছে। এখানে কবিতার মেজাজ গেছে পাল্টে; গভীর বেদনাবোধের জায়গায় দেখা দিয়েছে হাল্কা শ্লেষ। প্রথমে স্বামীটির বিদ্রুপাত্মক সংজ্ঞা উপস্থাপিত করা হয়েছে এভাবে "Home is the place, where, when you have to go there, They have to take you in" এর জবাবে তার স্ত্রী মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলেছে "I should have called it Something You, somehow, haven't to deserve.

'মজুরের মৃত্যু'র মতো মর্মস্পর্শী উপাখ্যান বিরল। কবিতাটির আদ্যন্ত একটি শান্ত পরিবেশ বিরাজমান বলেই এটি এতো মর্মস্পর্শী হতে পেরেছে। নিচু পর্দার সুরে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। এই কবিতা যেন চুপি চুপি বলা, তাই আড়ি পেতে শুনতে হয় প্রতিটি উচ্চারণ।

The flower Boat (পুষ্পতরী)

কোন কোন গ্রামে বিশেষত ছোট শহরগুলোয়, যেখানে মৎস্য সম্পদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে প্রধান শিল্প, সেখানে প্রায়শই দাঁড় টানা নৌকো, সমুদ্রগামী ছোট ডিঙ্গি চোখে পড়ে। সেগুলো রাখা থাকে সাজানো গোছানো লন্ এর উপর। তখন সেই নৌকো ভরা থাকে মাছে নয়, ফুলে। এই দৃশ্য বেমানান হলেও অতি সাধারণ। কিন্তু কবি দৃশ্যটির বেখাপ্পা ধরন, চেনা আর অচেনার সংমিশ্রণের চেয়ে বেশী কিছু দেখাতে চেয়েছেন এখানে। তিনি পুষ্পতরী এবং আরেকটি ভ্রমণের কল্পনাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন অজানায়।

চিনির বাগানে সন্ধ্যা (Evening in a sugar Orchard)

অন্ধকার বন, উজ্জ্বল সমুদ্রতীর, মজা নদী প্রসারিত গাছপালা আর তরঙ্গায়িত বালিয়াড়ি দেখে কবি মুগ্ধ হয়েছেন বারবার। যেভাবে তুষার অদৃশ্য হয়ে যায় তা দেখেও কবি মুগ্ধ। তুষার যখন অদৃশ্য হয় তখন কিছুই সাদা থাকে না আর, সাদা থাকে শুধু:

"... here a birch

And there a clump of houses with a church."

তুষার ভারাক্রান্ত বন শুধু একটি পটভূমি কিংবা শীতল মৃত্যুর নৈরাশ্যজনক অনুস্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়না। পক্ষান্তরে কবি নক্ষত্রপুঞ্জের অক্ষয় সান্ত্বনার কথাই বলেন আর জানান পুনরুজ্জীবনের বিজয় বার্তা।

Sitting by a bush in broad Sunlight"

(স্পষ্ট দিবালোকে একটি ঝোপের পাশে বসে)

কবিতাটি শেষ হয়েছে এক অবিচল বিশ্বাসের সুরের মধ্যদিয়ে। ফ্রস্টের লিরিক মালার অন্যতম উজ্জ্বল মুক্তো নিঃসন্দেহে "Stopping by woods on a snowy evening" নামক গীতি কবিতাটি। এর আবেদন মনের পরতে পরতে সঞ্চারিত হয় ফ্রস্টের বাক প্রতিভার যাদুবলে।

রবার্ট ফ্রস্ট ঃ কবি প্রতিকৃতি

রবার্ট ফ্রস্টের কাব্য বিচিত্র এবং বহুমুখীন। যে কোন মহৎ সৃষ্টির মতোই তাঁর কাব্য একাধিক স্তরে উপভোগ্য। কিন্তু তা কখনোই শুধু শব্দের কারসাজি বা কষ্টকল্পিত দার্শনিক দুর্বোধ্যতায় পর্যবসিত হয় না। ফ্রস্টকে কোন এক বিশেষ জাতের কবি, কোন এক বিশেষ গোষ্ঠী কিংবা মতবাদের কবি হিসেবে চিহ্নিত করা শক্ত। তাঁর বহু

কবিতায় বাস্তবতার স্বাক্ষর যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাঁর অনেক রচনায় অবাস্তব কুহেলিকা ঘেরা রহস্যময় জগতের স্বীকৃতিও দ্বিধাহীনভাবে উপস্থাপিত।

নাটকীয় ঘটনার সংস্থাপনে কথ্যভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে, কাহিনী পরিবেশনের আশ্চর্য দক্ষতায় তাঁর কাব্য যেমন একদিকে উজ্জ্বল, তেমনি গীতিকবিতার কোমল মাধুর্যে অন্যদিকে সরস।

ফ্রস্টের কবিতায় প্রকৃতি অত্যন্ত প্রাণবন্তরূপে উপস্থাপিত। গাছপালা, পাহাড়, বন, নদী, ঝরণা, তুষার, বরফ তাঁর কবিতার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির সাথে অতি নিকট সম্বন্ধে জড়িত প্রাণী জগৎ ঃ পাখি, ভোমরা, ঘোড়া, কাঠবিড়ালী, মৌমাছি প্রভৃতির সাক্ষাৎও আমরা তাঁর কবিতায় অহরহ পাই। ফ্রস্টের কবিতা থেকে এখন এগুলো ছেঁটে ফেললে শুধু যে বহিরঙ্গের দিক থেকেই তাঁর কাব্য দরিদ্রতর হবে তাই নয়, তাঁর অন্তরঙ্গ নিবিড় পরিচয়ও প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হবে। কারণ ফ্রস্টের কাব্যে অনেক সময় প্রকৃতি রূপক বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তার সত্যিকারের ভূমিকা বৃহত্তর। জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য পরিচয় কবির প্রকৃতি সম্পর্কিত বহু কবিতায় স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত Birches কবিতার কথাই ধরা যেতে পারে। সহজ সরল বর্ণনার স্তরে কবিতাটি পরম উপভোগ্য। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেই কেবল বাস্তব তথ্যের খুটিনাটির সঙ্গে আবেগের ব্যঞ্জনা মিলিয়ে এরকম বর্ণনা সম্ভব।

ফ্রস্টের কাব্যে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কি হার্ডির রচনায় যেমন প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উচ্চারিত দার্শনিক তত্ত্বনির্ভর মতামত দেখতে পাওয়া যায়, ফস্টের কাব্যে তেমন পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের অনেক চিত্র আমরা ফ্রস্ট-কাব্যে পাই। প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য সদ্ভাব স্থাপনের মাধ্যমেই জীবন সহজ ও সুন্দর হবে সে ইঙ্গিত তাঁর একাধিক কবিতায় উপস্থিত। The Ax-Helve কবিতায়, কি হাতিয়ার তৈরীতে, কি শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ প্রবণতার বিকাশ সাধনের প্রতিই জোর দেয়া হয়েছে। Brown's Descent কবিতায় ব্রাউন-

bowed with grace to natural law;

এবং Blue Berries কবিতার লোরেনও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মকে মেনে নেয়-

Just taking what nature is willing to give.

কিন্তু ফ্রস্টের অনেক কবিতায় এই রকম সুস্পষ্ট নির্দেশনাতো নেই-ই; বরং তার জায়গায় যেন ইচ্ছাকৃতভাবে একটা অস্পষ্টতা আরোপিত। এ কথা বলতেই হবে যে, ফ্রস্টের প্রকৃতি সম্পর্কিত বই কবিতা গীতি কাব্যের আবেগধর্মীতায় উষ্ণ। কোন

একটি বিশেষ অঞ্চল, কোন একটি বিশেষ কাল ও অনুভূতির সূর তার অনেক কবিতায় অতি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠে পাঠকচিত্তে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তার একটি কারণ অবশ্যই বিচিত্র ভান্ডার সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং আরেকটি কারণ তাঁর কবিতার অনায়াস গতিভঙ্গী ও ছন্দের মাধুর্য।

উপসংহার

ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতার এই সংকলনটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাব্য প্রতিভা, কর্ম ও কবিতার বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত সামনে চলে আসে। এই অংশটি বিশাল, তাকে ক্ষুদ্রতর এই পরিসরে আবদ্ধ করার চেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলাম এর অংশ হিসেবে পুস্তকটির সমালোচনা করাকে আমি 'নিতান্তই দায়বদ্ধতা' হিসেবে দেখিনি; বরং একজন মহান কবির অমর সৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নিয়েছি পুরোপুরি। বোধন ও প্রকাশের সীমাবদ্ধতার দায় আমার নিজের।

সমকালীন আমেরিকার সবচেয়ে বড় কবি বলে পরিচিত হওয়ার বহু পূর্বে রবার্ট ফ্রস্ট নিজের হাতে চাষের কাজ করতেন। তারো আগে ম্যাসাচুসেটস্ এর একটি মিলে সুতা গুটানোর কাজ করতেন। তাছাড়া জুতা তৈরী ও গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতার কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য কবিদের মতো তাঁকেও শ্রমশিল্পে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে দেখা যায়নি'। তাঁর একক শক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়, তাঁর মানবসত্তা ও কাব্যকর্মে সমভাবে বিদ্যমান। কবির জীবনের এই দিকটি আমাকে দারুণ আকৃষ্ট করেছে।

বইটি বেছে নিয়েছি মূলত ফ্রস্টের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে সহজাত কৌতুহল বশত ধারণা গঠনের জন্যে; বিশেষত প্রায় তিনদশক আগের একটি প্রকাশনার মান সম্পর্কে জানার জন্যে। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই এটি অত্যন্ত উন্নতমানের প্রকাশনা। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম একজন দিকপালকে দেশের সাহিত্যানুরাগীদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্যে অনুবাদক শ্রদ্ধেয় কবি শামসুর রাহমান এবং খোশরোজ কিতাবমহল সহ প্রকাশনার উপযোগী সবাই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

- ✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।
- ✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- ✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।
- ✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক ও জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক ও জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50